المادرية - بنغالي

মাতুরিদী ফেরকার আকীদাহ

ডক্টর আব্দুল মাজীদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়া'লান

Islamhouse.com

المحتوى الإسلامي

মাতুরিদী ফেরকার আকীদাহ

ডক্টর আব্দুল মাজীদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়া’লান

شركاء التنفيذ:

دار الإسلام جمعية الربوة رواد الترجمة المحتوى الإسلامي

يتاح طباعة هذا الإصدار ونشره بأي وسيلة مع

الالتزام بالإشارة إلى المصدر وعدم التغيير في النص.

Telephone: +966114454900

ceo@rabwah.sa

P.O.BOX: 29465

RIYADH: 11557

www.islamhouse.com

অসীম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে যিনি তাঁর রাসূলকে সকল দীনের ওপর বিজয়ী করার জন্যে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাবূদ নেই। তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং নবী ও রাসূলগণের সর্বশেষ ও সমাপ্তি। আল্লাহ সালাত প্রেরণ করুন তার ওপর, তার পরিবার ও তার সকল সাহাবীর ওপর এবং যারা ইহসানের সঙ্গে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাদেরকে অনুসরণ করবে তাদের সবার ওপর।

আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম পর:

এটি মাতুরিদী ফেরকার [১] ওপর একটি সংক্ষিপ্ত গবেষণা, এতে একটি ভূমিকা ও পাঁচটি পরিচ্ছেদ রয়েছেঃ

ভূমিকাঃএতে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছেঃ

প্রথম অনুচ্ছেদঃমাতুরিদী ফেরকা ও তার প্রতিষ্ঠাতার পরিচয়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃমাতুরিদী ফেরকার উৎপত্তিঃ

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃমাতুরিদী ফেরকা বিস্তারের কারণসমূহ।

প্রথম অধ্যায়ঃমাতুরিদী ফেরকার নিকট ইলম গ্রহণের উৎস ও দলিল পেশ করার পদ্ধতি।এতে পাঁচটি পরিচ্ছেদ রয়েছেঃ

প্রথম পরিচ্ছেদঃবিবেকের (যুক্তির) ওপর নির্ভর করা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ আকিদার ক্ষেত্রে 'খবরে ওয়াহেদ' (অর্থাৎ যেসব হাদীসে মুতাওয়াতির হাদীসের শর্তপূরণ হয়নি তার) দ্বারা দলিল গ্রহণ না করা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ রূপক অর্থ সাব্যস্ত করা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃঅপব্যাখ্যা করা ও সোপর্দ করা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ ভাল ও মন্দ উভয়কে বিবেক নির্ণয় করে এমন বলা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান,এতে পাঁচটি পরিচ্ছেদ রয়েছেঃ

প্রথম পরিচ্ছেদঃ মাতুরিদী ফেরকার নিকট দলিল বর্ণিত হওয়ার আগেই বিবেক দ্বারা আল্লাহর পরিচয় লাভ করা ওয়াজিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:মুকাল্লিদের(অন্ধঅনুসারীদের) ঈমান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ঈমানের অবশিষ্ট রুকনসমূহ, এতে তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছেঃ

প্রথম পরিচ্ছেদঃ রাসূলদের প্রতি ঈমান, এতে দু'টি অনুচ্ছেদ রয়েছেঃ

প্রথম অনুচ্ছেদঃ যা দ্বারা নবুওয়ত সাব্যস্ত হয়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ মু'জিযাহ ও কারামাহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ শেষ দিবসের প্রতি ঈমান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ফয়সালা ও তাকদীরের প্রতি ঈমান, এতে চারটি অনুচ্ছেদ রয়েছেঃ

প্রথম অনুচ্ছেদঃ ফয়সালা ও তাকদীরের প্রতি ঈমানের স্তরসমূহ।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ বান্দাদের কর্মসমূহ।

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ কুদরত (শক্তি) ও ইস্তেতা'আত (সামর্থ্য)।

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব প্রদান করা।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ঈমানের মাসআলাসমূহ, এতে পাঁচটি পরিচ্ছেদ রয়েছেঃ

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ঈমানের অর্থ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ঈমানের বৃদ্ধি ও হ্রাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ঈমানের ক্ষেত্রে ইস্তিসনা করা (ইনশাআল্লাহ বলা)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ ঈমান ও ইসলামের মধ্যকার সম্পর্ক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ কবিরাহ গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির হুকুম।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ মাতুরীদিয়্যাহ ও আশায়েরাদের মাঝে তুলনা, আরেএতে দু'টি পরিচ্ছেদ রয়েছেঃ

প্রথম পরিচ্ছেদঃ তাদের উভয়ের মধ্যকার প্রকৃত বিতর্কিত মাসআলাসমূহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ তাদের উভয়ের মধ্যকার শব্দগত বিতর্কিত মাসআলাসমূহ ।

উপসংহারঃ এতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ রয়েছে।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি প্রবন্ধটিকে তাঁর নিজের জন্যে খালিস করে নিন।

আল্লাহ অধিক ভালো জানেন। তিনি আমাদের নবী মুহাম্মাদের ওপর সালাত ও সালাম প্রেরণ করুন।

ডক্টর আব্দুল মাজীদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়া'লান

awalaan@gmail.com

ভূমিকাঃ

প্রথম অনুচ্ছেদঃমাতুরিদী ফেরকার পরিচয়ঃ

মাতুরিদী ফেরকারঃএটি একটি ধর্মতাত্তিক যুক্তিবাদী বিদআতি ফেরকা। তাদেরকে আবু মানসুর আল-মাতুরিদীর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। ফিরকাটি দীনের হাকিকত ও ইসলামী আকিদা প্রতিষ্ঠার জন্যে তাদের প্রতিপক্ষ মুতাজিলা, জাহমিয়াহ ও অন্যান্যদের মোকাবিলায় বিভিন্ন প্রমাণ এবং যুক্তিভিত্তিক ও তর্কশাস্ত্রীয় প্রমাণাদী ব্যবহার করার ওপর প্রতিষ্ঠিত।[২]।

আবু মানসুর আল-মাতুরিদীর পরিচয়ঃ

১- বংশ ও জীবনঃ

তিনি হলেন আবু মানসূর মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ ইবন মুহাম্মাদ আল-মাতুরিদী [৩] আস-সামারকান্দী আল-হানাফী আল-মুতাকাল্লিম (তার্কিক)। প্রাচীন সূত্রগুলো তাঁর জন্ম তারিখ উল্লেখ করেনি, তবে সমসাময়িক কতক ইতিহাসবিদ তার জন্ম তারিখ আনুমানিক ২৩৮হি. উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ ভালো জানেন [৪]। আর কতক ইতিহাসবিদ উল্লেখ করেছেন যে, তার জন্ম তারিখ ২৫৮হি. ছিল।

আর তার মৃত্যুর ব্যাপারে মাতুরিদীর সকল জীবনী লেখক একমত যে, তিনি ৩৩৩হি.-তে মারা গেছেন [৫]।

তিনি তখনকার আলেমদের কাছ থেকে হানাফী ফিকহের ইলম ও তর্কশাস্ত্র গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে নাসর ইবন ইয়াহইয়া আল-বালখী মৃত ২৬৮হি. ও বড় বড় অন্যান্য হানাফী আলেম, যেমন আবূ নাসর আল-ইয়াদী, আবূ বকর আহমাদ আল-জাওযজানী, আবূ সুলায়মান

আল-জাওযজানী। ফলে তিনি হানাফী বড় আলেমে পরিণত হন এবং কতক প্রসিদ্ধ আলেম তর্কশাস্ত্রে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

আবূ মানসুর যেসব বিষয়ে মুতাযিলাদের বিরোধিতা করেছেন সেসব বিষয়ে তার আকিদা মোতাবেক তাদের সঙ্গে অনেক বিতর্ক ও বাদানুবাদ রয়েছে এবং বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তার অনেক বইও রয়েছে।

তিনি মধ্য এশিয়ায় (সাইহুন ও জাইহুন নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে) মাতুরিদিদের নিকট ইমামুস সুন্নাহ ও ইমামুল হু ুদা উপাধীতে ভূষিত ছিলেন [৬]। তিনি মধ্য এশিয়ার মুতাযিলাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন, কিন্তু বিবেককে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি অনেকটা তাদের কাছাকাছি ছিলেন। তবে তাদের মত অতিরঞ্জন করেননি, বরং মৌলিক উৎস অর্থাৎ (ওহীর) বর্ণিত জ্ঞানের সাথে বিবেককেও আরেকটি উৎস জ্ঞান করেন। আর উভয় পক্ষের মাঝে বিরোধের সময় বর্ণনাকে বিবেকের ওপর প্রাধান্য দেন, তবে তিনি মনে করেন যে, বর্ণিত জ্ঞানের আগে বিবেক দ্বারাই আল্লাহর মারিফাত হাসিল করা (পরিচয় জানা) ওয়াজিব আর অবশ্যই আল্লাহ এই মারিফাত না থাকার কারণে ব্যক্তিকে শাস্তি দিবেন[৭]।

আব্দুল্লাহ আল-মুরাঈ (আল-ফাতহুল মুবীন) গ্রন্থে উসূলীদের স্তর বিন্যাস প্রসঙ্গে বলেন, "আবূ মানসুর দলিলে খুব শক্তিশালী ও বিতর্কে লা-জাওয়াবকারী ছিলেন। তিনি মুসলিমদের -অর্থাৎ মাতুরীদিয়্যাদের- আকিদার পক্ষে লড়েছেন ও নাস্তিকদের সন্দেহ দূর করেছেন"।[৮]

২- মাতুরিদীর রচনাবলীঃ

মাতুরিদীর অনেক রচনা রয়েছে, তন্মধ্যে:

১- প্রসিদ্ধ তাফসীর (তায়ীলাতু আহলিস সুন্নাহ) অথবা তায়ীলাতুল কুরআন), এটি মাতুরীদিয়্যাদের নিকট অনেক প্রসিদ্ধ ও পরিচিত

তাফসীর। তাদের কাছে তার আগের ও পরের কোনো তাফসীর তার সমকক্ষ নয়।

২- (আত-তাওহীদ) কিতাব। এটিকে তার ইলমুল কালাম (তর্ক শাস্ত্র) সংক্রান্ত রচনার ভেতর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গণ্য করা হয়। কারণ, এতে সে তার কালাম শাস্ত্র সংক্রান্ত দৃষ্টি ভঙ্গী স্থির করেছেন এবং বিশ্বাসগত গুরুত্বপূর্ণ মাসআলায় তার ইতিকাদ (বিশ্বাস)-কে বর্ণনা করেছেন।

৩- রিসালাহ ফিল ঈমান।

৪- আল-মাকালাত। এটিকে মাকালাত জাতীয় কিতাবসমূহের ভেতর সবচেয়ে পুরনো কিতাব জ্ঞান করা হয়। তবে কিতাবটি নেই।

৫- বায়ানু ওয়াহমিল মুতাযিলাহ।

৬- রাদ্দু তাহযীবিল জাদাল।

৭- রাদ্দু ওয়ীদুল ফুসসাক।

৮- রাদ্দু আওয়াইলুল আদিল্লাহ।

৯- রাদ্দু উসূলুল খামসাহ লি আবি মুহাম্মাদ আল-বাহিলী

১০- আর-রাদ্দু 'আলাল কারামিতাহ

১১- রাদ্দুল ইমামাহ, এটি কতক রাফিযীর প্রতিবাদ।

১২- মা'খাযুশ শারায়ে'

১৩- আল-জাদাল (৯)।

৩- মাতুরিদীর উস্তাদ ও ছাত্রগণ:

প্রথমত: তার উস্তাদগণ:

১- মুহাম্মাদ ইবন মুকাতিল আল-রাযী, তিনি ওয়াকী ও তার সমসাময়িকদের থেকে বর্ণনা করেছেন,তার ব্যাপারে বিরুপ মন্তব্য করা হয়েছে, তবে তাকে বর্জন করা হয়নি। তিনি ২৪৮হি.-তে মারা গেছেন। তার অনেক লিখনী রয়েছে, তন্মধ্যে : আল-মুদ্দাঈ ও আল-মুদ্দাআ আলাইহি [১০] উল্লেখ্যোগ্য।

২- আবূ নাসর আল-ইয়াদী আহমাদ ইবন আব্বাস ইবন হুসাইন ইবন জাবলাহ আস-সামারকান্দী। তিনি আহলুল ইলম ও মুজাহিদদের একজন ছিলেন, তবে তার থেকে কোনো বর্ণনা ও হাদীস নেই, কাফিরার তাকে বন্দি করে তুর্কি দেশে নাসর ইবন আহমাদ ইবন ইসমাইল ইবন আসাদ ইবন সামানের যুগে হত্যা করে।

৩- আবূ বকর আহমাদ ইবন ইসহাক আল-জাওযাজানী, তিনি যুগপৎ ইলমুল উসূল ও ইলমুল ফুরু' হাসিলকারীদের একজন ছিলেন। তিনি বিভিন্ন প্রকার ইলমে উঁচু স্তরের আলিম ছিলেন। তার রচিত (আল-ফিরাক ওয়াত তামীয) এবং (আত-তাওবাহ)-সহ আরও অনেক কিতাব রয়েছে।

৪- নুসাইর ইবন ইয়াহইয়া আল-বালখী, তার নাম নাসরও বলা হয়েছে। তিনি হানাফী ফিকহ ও ইলমুল কালামে (তর্কশাস্ত্রে) উঁচুমাপের আলিম ছিলেন। মৃত্যু ২৬৮হি.[১১]।

দ্বিতীয়ত: তার ছাত্রগণ:

১- আবুল কাসিম ইসহাক ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল ইবন ইবরাহীম ইবন যায়েদ আল-কাজী আল-হাকীম আস-সামারকান্দী। তিনি মাতুরীদী থেকে ফিকহ ও কালাম (তর্কবিদ্যা) গ্রহণ করেছেন। তাকে তার প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে গণ্য করা হয়। আবূল মুয়ীন উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ৩৩৫হি.-তে মারা গেছেন। আর কেউ কেউ বলেছেন ৩৪২হি.-তে।

২- আবূল হাসান আলী ইবন সায়ীদ আর-রুসতাগফানী। রুসতাগফানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে রুসতাগফানী বলা হয়, যা সামারকান্দের গ্রামসমূহের একটি গ্রাম। রুসতাগফানীর জীবনী লেখকগণ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সামারকান্দের বড় শায়খ ও মাতুরীদীর বড় বড় ছাত্রদের একজন ছিলেন। হানাফী কিতাবসমূহের ফিকহ ও উসূলে তার উল্লেখ রয়েছে।

৩- আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল কারীম ইবন মূসা ইবন ঈসা আল-ফাকীহ আল-বাযদাওয়ী। তিনি আবূ মানসূর মাতুরীদীর কাছে ফিকহ হাসিল করেছেন, হাদীস শৃ্ুনেছেন ও বর্ণনা করেছেন। বিশেষভাবে ফিকহে তিনি গভীর পাণ্ডিত্য হাসিল করেছেন। আল-কুরাশী বলেন, নাসাফের ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি রমযান মাসে ৩৯০হি.-তে মারা গেছেন।

৪- আবূ আহমাদ ইবন আবি নাসর আহমাদ ইবন আল-আব্বাস আল-ইয়াজী। তিনি মাতুরীদীর উস্তাদ আবূ নাসর আল-ইয়াজীর ছেলে।

৫- আবূ আব্দুর রহমান ইবন আবূল লায়স আল-বুখারী। তিনি আবূ মানসূর আল-মাতুরীদী থেকে কালাম শাস্ত্র ও ফিকহ হাসিল করেছেন। তিনি আবূল কাসিম আল-হাকীম আস-সামারকান্দীর সঙ্গী ছিলেন[১২]।

৬- আবূল ইউসর আল-বাযদাওয়ী (৪৯৩হি.)

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ মাতুরিদী ফেরকার উত্থান।

(হিজরী) তৃতীয় শতাব্দির শেষের দিকে আবূ মানসূর আল-মাতুরিদীর হাত ধরে মাতুরিদী ফেরকার উত্থান শুরু হয় এবং মুতাযিলা ও অন্যদের সঙ্গে কঠিন বিতর্ককারী হিসেবে চিহ্নিত হয়।

তার সফরগুলো ছিল মুতাযিলা ও অন্যদের বিরুদ্ধে, তবে তার নীতি আশআরীর নীতি থেকে ভিন্ন ছিল, যদিও তারা উভয়ে অনেক ক্ষেত্রে মিলে গেছেন, কিন্তু ঐতিহাসকি সূত্রগুলো তাদের উভয়ের মধ্যকার সাক্ষাত অথবা পত্র যোগাযোগ অথবা একে অপরের কিতাব সম্পর্কে অবগত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করে না।

অতঃপর আবূ মানসূরের কিছু ছাত্র তৈরি হয়,যারা তাদের শায়খ ও ইমামের চিন্তাসমূহ প্রসারে কাজ করেন এবং তার পক্ষে প্রতিরোধ করেন এবং শাখাগত মাসআলায় (বিধিবিধানে) ইমাম আবূ হানীফার মাজহাব অনুসরণ করে অনেক কিতাব রচনা করেন।সামারকান্দে মাতুরিদী ফেরকার আকিদা বিস্তারের কারণ এটিই ছিল।

মাতুরিদী ফেরকার প্রসার ঘটার পর তার অনুসারীরা লেখা-লেখি শুরু করেন এবং মাতুরীদিয়্যাহ আকিদার বর্ণনা ও তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনেক কিতাব রচনা করেন।

লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলেন আবূল মুয়ীন আন-নাসাফী (৪৩৮-৫০৮হি.)। তিনি মায়মুন ইবন মুহাম্মাদ ইবন মু'তামিদ আন-নাসাফী আল-মাকহুলী। তাকে মাতুরীদিয়্যাহ আলেমদের মাঝে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং যারা মাতুরীদিয়্যাহ মাযহাব প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছেন তাদের মাঝে সবচেয়ে বড় গণ্য করা হয়। আশআরিদের মাঝে বাকিল্লানী ও গাযালী যেমন মাতুরীদিয়্যাদেরর মাঝে তিনি তেমন। তার কিতাবসমূহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো (তাবসিরাতুল আদিল্লাহ), এটিকে মাতুরীদিয়্যাহ আকিদা জানার ক্ষেত্রে মাতুরীদী রচিত (আত-তাওহীদ) গ্রন্থের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসগ্রন্থ জ্ঞান করা হয়, বরং তা সাধারণভাবে মাতুরীদিয়্যাহ আকিদার ওপর সবচেয়ে ব্যাপক উৎসগ্রন্থ। তিনি তার (আত-তামহীদ) গ্রন্থে সংক্ষেপ করেছেন। তার (বাহরুল কালাম) নামেও একটি গ্রন্থ রয়েছে। আর তা

সংক্ষিপ্ত কিতাবসমূহের একটি যা তর্ক শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করেছে।

তাদের আরেকজন হলেন নাজমুদ্দিন ওমর আন-নাসাফী (৪৬২-৫৩৭হি.), তার অনেক শায়খ ছিল এবং অনেকে তার থেকে ইলম হাসিল করেছেন। তার রচিত কিতাবের সংখ্যা শতে গিয়ে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে : (মাযমাউল উলূম), (আত-তাইসীর ফি তাফসীরিল কুরআন), (আন-নাজাহ ফি শারহি কিতাবি আখবারিস সিহাহ ফি শারহিল বুখারী) এবং তার আকিদার কিতাব (আল-আকায়েদুন নাসাফিয়্যাহ) নামে প্রসিদ্ধ। এটিকে মাতুরীদিয়্যাহ আকিদার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মাতন (টেক্স) গণ্য করা হয়। এটি মূলত আবুল মুয়ীন আন-নাসাফীর (আত-তাবসিরাতুল আদিল্লাহ) কিতাবের সংক্ষেপিত রূপ।

অতঃপর বিষয়টি (মাতুরীদিয়্যাহ মতবাদ) প্রসার ও বিস্তার লাভ করতে থাকল এবং মাতুরীদিয়্যাহ আকিদার ওপর লিখনীর সংখ্যা বাড়তে থাকল, যেমন মুতুন (মৌলিক গ্রন্থসমূহ) ও ব্যাখ্যাসমূহ। ব্যাখ্যাসমূহের ওপর আবার ব্যাখ্যাসমূহ এবং ব্যাখ্যাসমূহের ওপর টিকাসমূহ প্রভৃতি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বাড়তে থাকল, যা মাতুরীদিয়্যাহ মতবাদের দাওয়াতের ধারক, বিশেষভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে, যেমন দেওবন্দী, ব্রেলভী প্রভৃতি মাদরাসাসমূহ [১৩]।

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ মাতুরীদিয়্যাহ মতবাদ বিস্তার লাভ করার কারণসমূহ।

মাতুরীদিয়্রাহ মতবাদ কয়েকটি কারণে বিভিন্ন জায়গায় বিস্তার লাভ করেছে, তন্মধ্যে নিম্নের কারণগুলো গুরুত্বপূর্ণ:

১- মূল কারণ,

বরং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো বাদশাহ ও সুলতানদের হানাফী মাযহাবকে গ্রহণ করা। এ কারণেই পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম, আরবে ও অনারবে, পারস্যে ও রোমে হানাফী মাযহাব বিস্তার লাভ করেছে। হানাফী মাযহাব বিস্তার লাভ ও তাদের সুলতানদের প্রভাবের ফলে মাতুরীদিয়্যাহ মতবাদ বিস্তার লাভ করেছে, কেননা মাতুরীদিয়্যাহরা শাখাগত বিধি-বিধানে হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিল।

আর শতাব্দি ধরে ঐতিহাসিকভাবে প্রসিদ্ধ যে, কোনো রাষ্ট্র যখন কোনো মাযহাবের দিকে ধাবিত হয়, তখন সে ঐ মাযহাবের আলেমদের জন্যে ফতোয়া, বিচারকার্য, নেতৃত্ব, খুতবাহ, লেখনি, পাঠদান প্রভৃতি সহজ করে দেন, ফলে তারা দেশ ও জাতির মাঝে নিজেদের কর্তৃত্ব বিস্তার করার অনেক উপকরণ ও সহজ পথ পেয়ে যান। অধিকন্তু রাষ্ট্রও তাদেরকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করেন। আর এভাবেই তাদের চিন্তার প্রসার ঘটে এবং তাদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়[১৪]।

এভাবেই মাতুরীদিয়্যাহ মাতবাদ ও তাদের আকিদা মধ্য এশিয়া, তুরস্ক, আফগানিস্তান, ভারত, চীন ও তার আশ-পাশের এলাকায় বিস্তার লাভ করেছে।

এ কারণটি ভারত ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মাতুরীদিয়্যাহ আকিদা প্রসারে শক্তিশালী ভূমিকা রখেছে। কেননা মুসলিম শাসকদের যুগে যেসব আলেম ও মাশায়েখ ভারতে অভিবাসী হয়েছেন তাদের অধিকাংশ ছিল মধ্য এশিয়ার আলেম, যারা পরবর্তী যুগের হানাফী ফকিহদের কিতাবসমূহের ওপর সবচেয়ে বেশী নির্ভরশীল ছিলেন। আর হাদীসের কিতাবসমূহের প্রতি তাদের গুরুত্বারোপ ছিল খুব দুর্বল এবং তারা গ্রিক ইলম দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।

২-মাতুরিদী ফেরকার মাদরাসাসমূহ এবং তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ও পাঠদান কার্যক্রম:

মাতুরীদিয়্যাহ আকিদা বিস্তারে তাদের মাদরাসাসমূহের ভূমিকা অনেক বড়। উসমানী খিলাফতের (অটোমান সাম্রাজ্যের) ইতিহাসে একই সময়ে হানাফী ও মাতুরীদিয়্যাহ আদর্শকে মদদ করা হয়েছে। ফলে উসমানী খিলাফতের বিস্তৃতির সমান মাতুরীদিয়্যাহ সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করতে থাকে। আর অধিকাংশ বিচারক,মুফতীগণ, জামে মসজিদের খতীবগণ ও মাদরাসার প্রধানগণ শাখা-প্রশাখাগত মাসআলায় হানাফী ও আকিদাগত বিষয়ে মাতুরীদিয়্যাহ মতবাদেরছিলেন।

৩- লিখনীর ময়দানে মাতুরিদীদের তৎপরতা:

মাতুরীদিয়্যাদের ইলমুল কালাম (তর্কশাস্ত্র) বিষয়ে লেখা-লেখির ময়দানে যথেষ্ট উদ্যমতা ও নিরলস প্রচেষ্টা রয়েছে। আর এসব লিখনীও বিস্তার লাভ করেছে। কাজেই এগুলোর বিস্তার লাভ ও তা পঠন-পাঠনের ফলে মাতুরীদিয়্যাহ আকিদা বিস্তার লাভ করেছে[১৫]।

৪- আরো বিষয় রয়েছে যার সমষ্টি তাদের বিস্তার লাভ করা ও তাদের দ্বারা মানুষের প্রভাবিত হওয়ার ক্ষেত্রে শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছে, যা নিম্নরূপঃ

ক- আহলুস সুন্নাহদের বেশ-ভূষায় তাদের জাহির হওয়া, বরং তাদের দাবী: তারা আর ‘আশআরীরাই আহলুস সুন্নাহর প্রতিনিধিত্ব করেন।

খ- তাদের কর্তৃক খাঁটী আহলুস সুন্নাহ ও আহলুল হাদীসদেরকে (আল্লাহর শরীর সাব্যস্তকারী) শরীরী (تجسيم), (আল্লাহর সাদৃশ্য সাব্যস্তকারী) সাদৃশ্যবাদী (تشبيه) প্রভৃতি বলে অপবাদ দেয়া।

গ- সালাফদের নামের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ত হওয়া, বিশেষভাবে দু'জন ইমাম: আবূ হানীফা ও শাফী'-র সঙ্গে।

ঘ- তাদের দাবী, অন্যান্য বিদআতিদের কাছে থাকা বাতিলের অপেক্ষা তাদের নিকট হকের পরিমাণ বেশী।

ঙ- তাদের কর্তৃক বাতিল ফিরকাদের প্রতিবাদ করা, যেমন প্রথম জাহমিয়্যাহ, মুতাযিলাহ, খারেজী, রাফিজী প্রভৃতি।

চ- সালাফদের আকিদা প্রচার,সত্য বর্ণনা ও প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কতক খাঁটী আহলুস সুন্নাহ ও আহলুল হাদীসের দূর্বলতা প্রকাশ পাওয়া[১৬]।

প্রথম অধ্যায়ঃমাতুরিদী ফেরকার নিকট শরীয়তের ইলম অর্জন করার উৎস এবং দলিল গ্রহণ করার নীতিমালা।

এতে রয়েছে পাঁচটি পরিচ্ছেদঃ

প্রথম পরিচ্ছেদঃ বিবেক/যুক্তির ওপর নির্ভর করা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ আকিদার ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহেদ দ্বারা দলীল গ্রহণ না করা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ রূপক অর্থ সমর্থন করা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ(সিফাত সংক্রান্ত নসগুলো) অপব্যাখ্যা করা ও (আল্লাহতে) সোপর্দ করা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ ভালো ও মন্দ নির্ধারণ বিবেকী বিষয় বলা।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ বিবেকের ওপর নির্ভর করা।

মাতুরীদিয়্যাহগণ দীনের মৌলিক বিষয়গুলোকে (عقليات) বিবেক ও যুক্তিনির্ভর এবং(سمعيات) বর্ণনা নির্ভর অর্থাৎ রাবীদের পরম্পরায় শ্রুতি/বর্ণনা নির্ভর)এমন দুই ভাগে ভাগ করেছেন। এরই ওপর বর্ণনার (কুরআন ও হাদীসের) ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান স্থির করেছেন তাদের দেয়া পরিভাষা “আকলিয়াত”বিবেক ও যুক্তি অধ্যায়ে।সুতরাং যুক্তিতে যে কোনো বর্ণনা তাদের বিবেকের বিরোধী হবে, যদি তা খবরে ওয়াহিদের প্রকার ভুক্ত হয় তবে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেন, আর যদি তা মুতাওয়াতির পর্যায় ভুক্ত হয়, তবে তারা তা বিকৃত করেন অথবা

বিভিন্ন ব্যাখ্যা দ্বারা অপব্যাখ্যা করেন, তবে যে বর্ণনা আখিরাতের সাথে সম্পৃক্ত তাতে তারা কোনো ব্যাখা করেন না [১৭]।

অতএব ইলম হাসিলের ক্ষেত্রে মাতুরীদিয়্যার উৎস হলো বিবেক। আবূ মানসূর আল-মাতুরিদী বলেনঃ "আল্লাহ ও আল্লাহর আদেশাবলীর ইলম ব্যাপক ও অসাধারণ, যা যুক্তি ও গবেষণা করা ছাড়া বুঝা যায় না"[১৮] অর্থাৎ বিবেকী গবেষণার ওপর নির্ভরশীল যুক্তি নির্ভর জ্ঞান ছাড়া বুঝা যায় না।

আর তিনি তার তাফসীরে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

﴿رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٦٥﴾ [النساء: 165]

(আমি সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণ আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।) [আন-নিসা : ১৬৫] "এসব ক্ষেত্রে দলীলের রহস্য ইবাদাত ও শরী'আতের ব্যাপারে জানার একমাত্র পথ হলো বর্ণনা(কুরআন ও হাদীস),বিবেক নয়,এমনটি হতে পারে না,বরং দীনকে আকঁড়ে ধরার পথই হলো বিবেক।কাজেই বিবেক সাব্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর, দীনের ক্ষেত্রে তাদের জন্যে কোনো আপত্তি আল্লাহর ওপর থাকবে না" [১৯]

অনুরূপ মাতুরীদিয়্যারা তাওহীদের বিষয়গুলোকে আকলিয়াতে(বিবেকনির্ভর) পরিণত করেছেন,ফলে এসব ক্ষেত্রে তারা "বর্ণনাগত ইলম"কে বিবেকের অনুগামী বানিয়েছেন।আর এই আকলিয়াত হলো (আল্লাহর) ওই আটটি সিফাত-গুণ যেগুলোকে তারা বিবেক সাব্যস্ত সিফাত নামকরণ করেন।আবার তারা তা সিফাতুল মা'আনি (অর্থগত সিফাত) নামেও আখ্যায়িত করেন,এবং

তারা সিফাতগুলো (আল্লাহর জন্যে) সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে বিবেকি দলীলসমূহের ওপর নির্ভর করেন,যা তাদের নিকট অকাট্য দলীল। আর তারা কেবল তাদের বিবেকী দলীলের সমর্থনের জন্যে শরীয়তের দলীল সমূহকে উল্লেখ করেন,তার ওপর নির্ভর করার জন্যে নয় [২০]।

আর আখিরাত ও নবুওয়াতের বিষয়সমূহকে শ্রুত-বর্ণনা নির্ভর বানিয়েছেন। যেগুলো তারা শারীয়াহ নামেও প্রকাশ করেন।

আর তারা শারইয়্যাতকে সংজ্ঞায়িত করেছেন যে,তা এমন কতক বিষয় যা সাব্যস্ত ও অসাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাব্যতা নিশ্চিত করবে বিবেক,তবে তার পর্যন্ত পৌঁছার পথ বিবেকের নেই। আর যা অনুরূপ নয় তাই আকলিয়্যাত [২১]।

আবার তাদের কেউ নবুওয়াতের আলোচনাকে আকলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন [২২]।

মাতুরীদিয়্যারা বিবেকের (আকলের) ব্যাপক কুদরত স্বীকার করেন না, যেহেতু তাদের নিকট বিবেক বস্তুসমূহের বাহ্যিক বুঝতে পারে, তার ভেতরগত অবস্থা ও হাকিকত বুঝতে পারে না। মাতুরীদী এটি স্পষ্ট করে বলেন: “বিবেককে সীমাবদ্ধ করে সৃষ্টি করা হয়েছে, যা বস্তুসমূহের আদ্যোপান্ত বেষ্টন করতে অপারগ, আর বুঝসমূহ কোনো জিনিসের শেষসীমায় পৌছতেও অক্ষম।” [২৩] এতদাসত্বেও তারা তাদের উদ্দেশ্যে পৌঁছতে চেষ্টা করেন, আর তা হলো বিবেক ও বর্ণনার মাঝে মধ্যস্ততার চেষ্টা করা। আর এটি তাদেরকে আকিদাসমূহ দুই ভাগ করতে উদ্‌বুদ্ধ করেছে: ইলাহিয়্যাত ও নাবুওয়াত যা সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে বিবেক স্বয়ংসম্পন্ন। আর সামইয়্যাত যা সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে বিবেক স্বয়ংসম্পন্ন নয় এবং তা বর্ণিত (শ্রুত) ইলম ছাড়া আয়ত্তে আনা যায় না[২৪]

আর এই নীতি যার দ্বারা মাতুরীদিয়্যারা আকল ও নকল (বিবেক ও বর্ণনা) এর মাঝে মধ্যস্থতার চেষ্টা করেছেন,তার ভিত্তিই মূলত একটি বাতিল চিন্তার ওপর দাঁড়িয়ে। তা হলো ওহীর নসগুলো বিবেকের বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। মৌলিক বিষয়ের ক্ষেত্রে এই ধারণাপ্রসূত সংঘর্ষ বাস্তবে দার্শনিকদের পথ ও পন্থা।যারা নবুওয়ত সাব্যস্ত করে না এবং যারা রাসূলদের প্রেরণ করা ও তারা যা নিয়ে এসছেন তা প্রতিষ্ঠিত সত্য মনে করে না। বস্তুত কোনো বিষয় প্রমাণ করার ক্ষেত্রে তাদের উৎস হলো বিবেক, কাজেই বিবেক যা সাব্যস্ত করবে তা সাব্যস্ত আর বিবেক যা নাকচ করবে তা অসাব্যস্ত।

ইমাম আবুল মুযাফফর আস-সুমআনী রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ “জেনে রাখুন যে, আমাদের ও বিদ`আতিদের মাঝে পার্থক্য হলো বিবেকের মাসআলা। কেননা তারা তাদের দীনের ভিত্তি বিবেকগ্রাহ্য বিষয়ের ওপর রেখেছে আর ইত্তেবা (অনুসরণ) ও বর্ণনাগত বিষয়কে বিবেকগ্রাহ্য বিষয়ের অনুগত করেছে। পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাহগণ বলেন, দীনের ক্ষেত্রে মূল হলো ইত্তেবা (অনুসরণ) আর বিবেক হলো তার অনুগামী। যদি দীনের মূল ভিত্তি বিবেকগ্রাহ্য বস্তুর ওপর হয়, তাহলে মাখলুক ওহী ও নবী আলাইহিমুস সালামদের থেকে অমুখাপেক্ষী হত এবং (শরীয়তের) আদেশ ও নিষেধ বাতিল হয়ে যেত। আর যে যা চাইত তাই বলত। আর যদি দীনের ভিত্তি বিবেকগ্রাহ্য বস্তুর ওপর হত তাহলে মুমিনদের জন্যে বস্তুসমূহ না বুঝা পর্যন্ত গ্রহণ না করা ওয়াজিব হত। আমরা যখন দীনের বিষয়ে যা এসেছে তাতে চিন্তা করি, যেমন আল্লাহ তা‘আলার সিফাতের উল্লেখ এবং মানুষ (তার বিশ্বাস দ্বারা) যে ইবাদত করেছে, অনুরূপভাবে যা মুসলিমদের মাঝে প্রকাশ পেয়েছে এবং যা তারা নিজেদের মাঝে একে অপর থেকে গ্রহণ করেছে এবং যা তারা তাদের পূর্বসূরীদের পরম্পরায় বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে, যেমন কবরের আযাব, দুইজন ফেরেশ্তার প্রশ্ন,

হাউজে কাউসার, মীযান, পুলসিরাত ও জাহান্নামের বর্ণনা এবং দুই গ্রুপের তাতে স্থায়ী হওয়া প্রভৃতির উল্লেখ। এগুলো এমন বিষয় যার হাকিকত বুঝা আমাদের বিবেক দ্বারা সম্ভব নয়, কিন্তু তা কবুল করা ও তার প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। আর যখন আমরা দীনের কোনো বিষয় শ্রবণ করি এবং তা আত্মস্থ করি ও বুঝি, তাতে আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর এবং তার কাছ থেকেই তাওফিক। আর আমাদের পক্ষে যা আয়ত্তে আনা ও বুঝা সম্ভবপর হয়নি এবং আমাদের বিবেক যার পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি, আমরা তার প্রতি ঈমান আনলাম, তাতে সত্যারোপ করলাম এবং বিশ্বাস করলাম যে, এটি তার রুবুবিয়্যাহ ও কুদরতের পক্ষ থেকে এবং তাতে তার ইলম ও ইচ্ছাকে আমরা যথেষ্ট মনে করলাম। আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ٨٥﴾ [الإسراء: 85]

“আর আপনাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন, ‘রূহ আমার রবের আদেশঘটিত এবং তোমাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে অতি সামান্যই।” [আল-ইসরাঃ ৮৫], আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

﴿.... وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ ...﴾ [البقرة: 255]

(আর তারা তাঁর ইলমের সামান্য পরিমাণও আয়ত্ত করতে পারে না, তবে তিনি যা চান তা ছাড়া।) [আল-বাকারাহ : ২৫৫] অতঃপর (সুম‘আনি) রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “বস্তুত আমাদের ওপর আবশ্যক হলো আমরা যা বুঝব তা ঈমান ও বিশ্বাসসহ গ্রহণ করব আর আমরা যা বুঝব না তা বশ্যতা স্বীকার ও আত্মসমর্পণ করে গ্রহণ করব। এটিই জনৈক আহলুস সুন্নাহের নিম্নের কথার অর্থ, “ইসলাম একটি পুল যা আত্মসমর্পণ করা ছাড়া অতিক্রম করা যায় না”[২৫]।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ খবরে ওয়াহেদসমূহ দ্বারা আকিদার ক্ষেত্রে দলিল গ্রহণ না করা।

মাতুরীদিয়্যাদের নিকট আকিদা সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে তাদের আদর্শগত মূল নীতি হলো আকিদার অধ্যায়ে খবরে ওয়াহেদসমূহ কে দলিল হিসেবে গ্রহণ না করা, কাজেই তারা আল-কুরআনুল কারীম ও মুতাওয়াতির হাদীস ছাড়া দলিল পেশ করেন না। আবার তারা অর্থ সুস্পষ্ট না হলে আল-কুরআনুল কারীম অথবা হাদীস দ্বারাও আকিদা সাব্যস্ত করেন না [২৬]।

তারা বলেন, আহাদ হাদীসসমূহ ধারণার ফায়দা দেয়, নিশ্চিত ইলমের ফায়দা দেয় না। কেননা তা রাসূলের খবর কিনা সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর হাদীস রচনা না করার নিরাপত্তা নেই[২৭]।

তারা আরও বলেন, শরয়ী আহকামে খবরে ওয়াহিদ গ্রহণ করা হবে, আর তা হলো দীনি বিষয়ে সতকর্তা ও নিশ্চিতকে আকড়ে ধরার স্বার্থে। অধিকন্তু প্রত্যেক ঘটনায় মুতাওয়াতির পাওয়া যায় না, যদি খবরে ওয়াহিদকে প্রত্যাখ্যান করা হয়, তাহলে বিধানসমূহ বাতিল হয়ে যাবে[২৮]।

তিনি (আত-তাওহীদ) ও (আত-তাওয়ীলাত) কিতাবে খবরে ওয়াহিদগুলো দ্বারা মাতুরীদি আকিদাসমূহে দলিল না গ্রহণ করার বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, খবরে ওয়াহিদ ইলমকে ওয়াজিব (আবশ্যক) করে না। কেননা তা ইলম ও সাক্ষ্য ওয়াজিব করার ক্ষেত্রে মুতাওয়াতিরের স্তরে উন্নীত হয় না, তবে তার দ্বারা আমল ওয়াজিব হবে। আর তিনি খবরে ওয়াহিদ দ্বারা আমল ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে দলিল পেশ করেছেন ওই ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর নির্দেশ দ্বারা, যে জিহাদ থেকে বিরত থেকে দীন শিক্ষা করার

উপযুক্ততা রাখে, যেন তারা (ইলম অর্জন করার পর) যখন তাদের কওমের নিকট ফিরে যাবে তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে[২৯]।

প্রকৃতপক্ষে মাতুরীদিয়্যারা একেবারেই শরীয়তের আমলগত বিধানেও সহীহ খবরে ওয়াহিদ দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন না, বরং তাদের নিকট হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্যে তারা যেসব নিয়ম ও মূলনীতি স্থির করেছেন তার মোতাবেক হওয়া ওয়াজিব। এটি তাদের একাধিক আলেম স্পষ্ট বলেছেন। আবূ যায়েদ দাবুসী (তা'সীসুস নাযর) কিতাবে বলেনঃ "আমাদের সঙ্গীদের নিকট মূলনীতি হলো, খবরে ওয়াহিদ যখন নীতিগুলোর বিপরীত বর্ণিত হবে, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, (তিনি লিঙ্গ স্পর্শ করার কারণে ওযু ওয়াজিব করেছেন), আমাদের সঙ্গীগণ তা গ্রহণ করবেন না। কেননা তা নীতিসমূহের বিপরীত বর্ণিত হয়েছে।" [৩০]

আকিদার ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহিদ দলিল নয় মর্মে মাতুরীদিগণ ও তাদের সঙ্গে একমত পোষণকারীদের কথার কোনো ভিত্তি নেই। বরং তা বিদআত ও নব-আবিষ্কৃত। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত খবরকে মুতাওয়াতির ও আহাদ হিসেবে ভাগ করা সাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগে প্রসিদ্ধ ছিল না। অনুরূপভাবে খবরে ওয়াহিদ ইলমের ফায়দা দেয় না কথাটিও কাদারী ও মুতাযিলাদের আবিষ্কৃত। এতে তাদের উদ্দেশ্য হলো হাদীসসমূহকে ছুড়ে মারা ও প্রত্যাখ্যান করা। কেননা এগুলো তাদের বিপক্ষে দলিল [৩১]।

ইমাম শাফেঈ' রাহিমাহুল্লাহ "আর-রিসালাহ" গ্রন্থে খবরে ওয়াহিদ দলিল হওয়ার ওপর মুসলিমদের ঐকমত্য নকল করেছেন। যেমন তিনি বলেন: "যদি কোনো মানুষের পক্ষে বিশেষ কোনো ইলমে বলা বৈধ হত যে, পূর্বাপর সকল মুসলিম খবরে ওয়াহিদ সাব্যস্ত করা ও তার শরণাপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে একমত হয়েছেন—কেননা মুসলিম

ফকীহদের থেকে এমন কাউকে জানা যায়নি যিনি তা সাব্যস্ত করেননি—, তাহলে আমার জন্য তা বলা বৈধ হত।"[৩২] তিনি খবরে ওয়াহিদ দলিল হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করার পর বলেঃ, "আমাদের পূর্বপুরুষদের নীতি এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্ম থেকে নিয়ে আমরা যাদের দেখছি তাদের সবার এই নীতিই ছিল।" [৩৩]

'আকিদা ও আহকামে খবরে ওয়াহিদকে দলিল বলা ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহুর মাযহব। মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ওরফে ইবন খুওয়াইযমানদাদ যেমনটি তার থেকে উল্লেখ করেছেন[৩৪]। এটি ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহুরও কথা। মারওয়াযী রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ "আমি আবূ আব্দুল্লাহকে বললাম, এখানে দু'জন ব্যক্তি রয়েছেন তারা বলেন: যে মনে করে খবরে ওয়াহিদ আমলকে ওয়াজিব করে ইলমকে ওয়াজিব করে না। তিনি তাকে ভর্ৎসনা করেন, আর বললেন, আমি জানি না এটা কী"[৩৫]

আর আবূ হানীফা থেকে খবরে ওয়াহিদ ইলমের ফায়দা দেয় না অথবা তিনি তা গ্রহণ করার ব্যাপাারে আকিদা ও আমলের মাঝে বিভাজন করেছেন এমন কিছু জানা যায়নি, বরং তার থেকে বিভাজন ছাড়াই হাদীসসমূহ কবুল করার বিষয়টি বর্ণিত আছে। যেমন তার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলেছেনঃ "যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস আসে আমরা তা ছেড়ে অন্য দিকে যাব না। আর আমরা তাই গ্রহণ করব" [৩৬] আর তাই হলো সালাফ এবং সকল মুহাদ্দিস ও নীতিবিদদের মাযহাব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : রূপক অর্থ সাব্যস্ত করা।

মাতুরীদিয়্যারা আরবী ভাষা, আল-কুরআন ও আল-হাদীসে রূপকতা সংঘটিত ও সাব্যস্ত আছে মনে করে থাকে। ইবনুল হুমাম বলেনঃ "আরবী ভাষা, আল-কুরআন ও আল-হাদীসে রূপকতার বাস্তবতা রয়েছে। [৩৭] তাদেরকে রূপকতা সাব্যস্ত করার দিকে ধাবিত করেছে তাদেরই বিশ্বাস যে, নস (কুরআন-হাদীস)-কে তার প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ করা হলে (আল্লাহর) শরীর ও সাদৃশ্যতাকে আবশ্যক করা হয়। বায়াধী বলেনঃ "যেহেতু ওই সব কুরআন ও হাদীসের দলীলকে তার প্রকৃত অর্থে, যেমন শরীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, স্থানে সীমাবদ্ধ হওয়া ও মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়াশীল হওয়ার ওপর প্রয়োগ করা গেল না অকাট্য দলিলের বাধার কারণে। আবার কাইফিয়্যাত (আকৃতির বর্ণনা) ছাড়া সিফাতের প্রকৃতি না বুঝার কারণে আসল অর্থও বাতিল করা বৈধ নয়, কাজেই আকৃতি ছাড়া সিফাতকে রূপক অর্থে প্রয়োগ করা হবে"[৩৮]।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের নিকট কুরআন ও হাদীসের দলীলের (নসের) রূপক অর্থ সাব্যস্ত করার নীতি নব আবিষ্কৃত ও বিদআত। এর কোনো ভিত্তি নেই। কেননা পূর্বসূরী ভাষাবিদ আলেমগণ যেমন, খলীল ইবন আহমাদ, সীবওয়েহ ও আবূ আমর ইবনুল আলা রূপক অর্থ নিয়ে কথা বলেননি। অনুরূপভাবে পূর্বসূরী ফকিহ ও উসূল নীতিবিদদের নিকটও (হাকিকত ও মাজায) এই ভাগ পাওয়া যায় না। শাফেয়ী' রাহিমাহুল্লাহ প্রথম নীতি শাস্ত্রে (ইলমুল উসূলে) কথা বলেছেন, এই শাস্ত্রে তার গুরুত্বপুর্ণ কিতাব আমাদের নিকট পৌঁছেছে, আর তা হলো (আর-রিসালাহ)। অথচ তার এই কিতাবে এই ভাগের প্রতি দূর থেকে বা কাছ থেকে নূন্যতম কোনো ঈঙ্গিত পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী তার কিতাব আল-জামিউল কাবীরে শব্দের হাকীকত

ও মাজায (প্রকৃত ও রূপক অর্থ) নিয়ে কথা বলেননি। যেমন তিনি এই ভাগ কোনো ইমাম থেকেও বর্ণনা করেননি, যেমন মালিক, আবূ হানীফা, সাওরী, আওযাঈ’ প্রমুখ [৩৯]।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ “যে বলবে উসূল নীতিবিদদের কেউ ... ‘রূপক থেকে প্রকৃত অর্থ কয়েকভাবে জেনেছেন, তন্মধ্যে ভাষাবিদদের এ বিষয়ে স্পষ্ট কথা বলা, যেমন তাদের বলা: এটি হাকিকত (প্রকৃত অর্থ) ও এটি মাজায (রূপক অর্থ)।’অবশ্যই তিনি না জেনে কথা বলেছেন। কেননা তিনি ধারণা করেছেন যে, ভাষাবিদগণ এটি বলেছেন, অথচ ভাষাবিদ, উম্মতের আদর্শ মনীষী ও আলেমদের কেউ তা বলেননি” [৪০]।

আর ইবনুল কায়্যিম বলেন, “আর যখন জানা গেল যে, শব্দকে হাকিকত ও মাজাযে ভাগ করা শরয়ী, বিবেকী ও ভাষাগত কোনো ভাগ নয়, তা শুধুই একটি পরিভাষা, যা সৃষ্টি হয়েছে নস দ্বারা শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত তিন যুগের পর। আর তার উৎপত্তি হয়েছে মুতাযিলা, জাহমিয়্যাহ এবং কালাম শাস্ত্রবিদ থেকে যারা তাদের পথে চলেছেন তাদের থেকে” [৪১]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : কুরআন ও হাদীসের(নসকে) দলীলকে ব্যাখ্যা করা অথবা (তার অর্থ আল্লাহতে) সোপর্দ করা প্রসঙ্গঃ

মাতুরীদিয়্যাদেরর নিকট দর্শন-যুক্তির ক্ষেত্রে আকিদা গ্রহণ করার উৎস হলো আকল-বিবেক। তাই বিবেকই হলো বিচারক ও সমাধানের মূল। আর অহী-দলীলের বর্ণনা হলো তার অনুগামী ও তার থেকেই সৃষ্ট শাখা। কাজেই যখন কোনো বর্ণনা বিবেকের বিপরীত বর্ণিত হবে তখন তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করা অথবা তা ব্যাখ্যা দ্বারা পরিবর্তন করা এবং তাকে তার বাহ্যিক অর্থ থেকে ফিরিয়ে আনা জরুরি। তবে তাদের নিকট গায়েব-অদৃশ্যের ক্ষেত্রে আকিদা গ্রহণ করার উৎস হলো অহী (বর্ণনা)।

অতএব মুতাওয়াতিরসমূহ- যেমন আল-কুরআনুল কারীম ও মুতাওয়াতির সুন্নাহসমূহের নস-দলীলের ওপর তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এগুলো যদিও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত, কিন্তু তা অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে যান্নী (তার অর্থ সুনিশ্চিত নয়)। কেননা তা হলো শাব্দিক দলিল ও ধারণানির্ভর বাহ্যিক অর্থ, যা ইয়াকিনের ফায়দা দেয় না, পক্ষান্তরে তা অকাট্য বিবেকী দলিল বিরোধী। আর বিবেকী দলিল হলো অকাট্য দলিল। আর বিরোধের সময় বিবেকী দলিলকে প্রাধান্য দেয়া হবে, কেননা তাই হলো আসল[৪২]।

আর অহীবর্ণনাগত দলিল হয় (তার অর্থ আল্লাহতে) সোপর্দ করা হবে, নতুবা (তার অর্থ) ব্যাখ্যা করা হবে[৪৩], পক্ষান্তরে বিবেকী দলিলকে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব [৪৪]।

আর তারা উভয়টির মাঝে কোনটিকে প্রাধান্য দিবে তা নিয়ে নিজেদের মাঝে বিরোধ করেছেন। তাদের কেউ এই আয়াতসমূহে— অর্থাৎ সংবাদগত সিফাতের আয়াতসমূহে— বলেছেন যে, এগুলো

মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট), আমরা তাতে বিশ্বাস করি যে, তাকে তার বাহ্যিক অর্থের ওপর প্রয়োগ করার কোনো সুরুত নেই এবং আমরা তার ব্যাখ্যা নিয়েও ব্যস্ত হব না। বরং আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তার দ্বারা যা ইচ্ছা করেছেন তা হক।

আর তাদের কেউ আয়াতের বাহ্যিক অর্থকে এড়িয়ে তার সম্ভাব্য বিভিন্ন অর্থ বর্ণনায় ব্যস্ত হয়েছেন। তারা বলেনঃআমরা জানি যে, শব্দগুলো যেসব অর্থের সম্ভাবনা রাখে তার কতক অর্থ তার দ্বারা উদ্দেশ্য, যা তাওহীদ ও আদি হওয়ার বিপরীত নয়। তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যের ব্যাপারে নিশ্চিত হন না, কারণ উদ্দেশ্যকে চূড়ান্তকারী ও কতক অর্থকে নির্দিষ্টকারী কোনো দলিল নেই।

তিনি আত-তামহীদ গ্রন্থে সিফাতের আয়াতগুলো উল্লেখ শেষে বলেনঃ "হয়তো আমরা তার নাযিল হওয়ার ওপর ঈমান আনব আর তার ব্যাখ্যা নিয়ে ব্যস্ত হব না, অথবা তা এমন ব্যাখ্যাতে নিয়ে যাওয়া হবে যা তাওহীদ মোতাবেক হয়" [৪৬]।

মাতুরীদিয়্যা ও অন্যান্য আহলে মানতেক -আহলে কালামের (মগজপ্রসূত মতানুসারীদের সিফাতের আয়াতে) ব্যাখ্যার কথা বলা সুস্পষ্ট ভ্রান্তি। তাতে তাদের স্ববিরোধিতা এই ভ্রান্তির বড় প্রমাণ। আর স্বীকৃত যে, স্ববিরোধিদের কথা বাতিল। এ জন্যেই তাবীব ইবন নাফীস বলতেন: মাযহাব কেবল দু'টিই: আহলুল হাদীসদের মাযহাব অথবা ফেলুসুফিদের মাযহাব। আর এসব আহলে মানতেক-আহলে কালামের কথা স্ববিরোধী ও বিরোধপূর্ণ[৪৭]। এর দ্বারা "তিনি উদ্দেশ্য করেছেন যে, আহুলুল হাদীসগণ রাসূল যা নিয়ে এসছেন সেগুলো সাব্যস্ত করেছেন। অপর পক্ষে তারা সবগুলোকে ধারণা ও কল্পনা নির্ভর বানিয়েছেন। আর এসব নাস্তিকদের মাযহাবের ভ্রষ্টতা অহী (বর্ণিত) ও যুক্তির বহু দলিল দ্বারাই জানা গেছে। অতএব নির্ধারিত হয়

যে, সালাফদের অর্থাৎ আহলুল হাদীস ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মাযহাবই হক"[৪৮]

এ জন্যে ব্যাখ্যার বিষয়ে তাদের স্থির কোনো নিয়ম নেই, ফলে তারা কোন দলীলগুলোতে ব্যাখ্যার প্রয়োজন আর কোনগুলোতে ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই তা পৃথক করতে পারেন না।যেমন তাদের সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম বলেন, "তারা কতক অহীরদলিলকে বাদ দিয়ে কতক দলিলের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাকে ওয়াজিব করেন। বস্তুত আহলে কিবলা বরং অন্যদের ভেতরও এমন কেউ নেই, যার পক্ষে সকল অহীর দলিলের ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

বিষয়টি যখন এমনই, তখন তাদেরকে বলা হবে: তোমরা যার ব্যাখ্যাকে (রূপক অর্থকে) অনুমোদন দিয়েছো তারপর তার বাহ্যিক ভাব ও স্পষ্ট অর্থ বাদ দিয়ে তাকে (রূপক অর্থে) ফিরিয়ে এনেছো এবং তোমরা যা (-র প্রকৃত অর্থ) স্বীকার করে নিয়েছো তার মাঝে পার্থক্য কী?

তারা তখন দু'টি বিষয়ের মাঝে থাকবে: হয়তো তাদের জমহুর বিদ্যানগণ যা বলেন তাই তারা বলবেন যে, বিবেকী অকাট্য দলিল যার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে আমরা তার ব্যাখ্যা করব আর বিবেকী অকাট্য দলিল যার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে না আমরা তা স্বীকার করে নিব।

তখন তাদেরকে বলা হবে: এ অবস্থায় তো কোনো জিনিস থেকেই ব্যাখ্যাকে নাকচ করা তোমাদের সম্ভব হবে না, কেননা সকল বিবেকী বিরোধকে নাকচ করা তোমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

অধিকন্তু অকাট্য বিবেকী বিরোধ না থাকাটা অহীর দলিলের অর্থ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়াকে ওয়াজিব করে না;কেননা তা তোমাদেরই কথা মতে যখন তোমরাই শরীয়ত প্রণেতার ওপর এমন কথা বলা বৈধ

রেখেছো, যার বোধগম্য অর্থ থাকবে অথচ তিনি তা উদ্দেশ্য করবেন না।’ কেননা বিবেকীয় সূক্ষ্ম বিষয়গুলোতে যা অধিকাংশ মানুষের অন্তরে উদ্রেক হয় না অথবা যুগযুগ ধরে মাখলুকের জন্যে উদ্রেক হয় না এমন কিছু থাকতে পারে যা তার (অর্থ) বিরোধী হবে। কাজেই তার (শরীয়ত প্রণেতার) কথা দ্বারা বিবেকী অকাট্য দলিলের বিরোধিতা ছাড়াই তার অর্থের বিপরীত উদ্দেশ্য নেওয়া বৈধ, কারণ পরবর্তীতে তার অর্থের বিপরীত বিবেকী অকাট্য দলিল প্রকাশ পাওয়া বৈধ অথবা যেহেতু বিবেকী দলিল দ্বারা অর্থটি জানা যায়নি প্রভৃতি। কারণ, যখন বৈধ হলো যে, তিনি যেসব বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন তাতে তাকে মানুষের বিশ্বাস করা ওই শর্তের (অর্থাৎ তার অর্থ বিরোধী বিবেকী দলিল না থাকার) ওপর নির্ভরশীল হবে, তখন তার ন্যায় অন্যান্য শর্তেরও ওপর নির্ভরশীল হওয়া বৈধ হবে, কেননা সবই (অর্থাৎ সব সংবাদ-ই) এ জাতীয় শর্তের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার ক্ষেত্রে সমান, যা আবশ্যক করে যে, তিনি যে সংবাদ দিয়েছেন তার কোনোটি দ্বারা ইলমের ওপর দলিল পেশ করা যাবে না।

আর তারা যদি প্রত্যেক জিনিসেই ব্যাখ্যার কথা বলেন, তবে যার ব্যাপারে শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য নিশ্চিতভাবে জানা গেছে তা ছাড়া, তাহলে তা অধিক পাকাপোক্ত হয়। কেননা যে কোনো নসই বর্ণিত হয়েছে, তাতে তার প্রত্যাখ্যানকারীর জন্যে বলার সুযোগ আছে যে, শরীয়ত প্রণেতা এটাই উদ্দেশ্য নিয়েছেন তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না।

কেননা যদি সাব্যস্তকারী বলতে পারে যে, আমি নিশ্চিতভাবে জানি তিনি তাই উদ্দেশ্য করেছেন, তাহলে এই সাব্যস্তকারীর বিপক্ষও এরূপ কথা বলতে পারে।

বস্তুত আপনি যখন তাদের কথায় চিন্তা করবেন, তখন কীসে ব্যাখ্যা করা হবে আর কীসে ব্যাখ্যা করা হবে না তাতে তাদের কোনো

নীতি পাবেন না। বরং তাদের কথার অবশ্যম্ভাবী নীতি হলো, সবকিছুর ব্যাখ্যা করা সম্ভব... কাজেই জানা গেল যে, তাদের কথা বাতিল ...” [৪৯]

অতঃপর তাদেরকে বলা হবে: তোমাদের পরিভাষা মোতাবেক দলীলের (নসের) ব্যাখ্যা (তাবিল) করা তাশবীহ ও তা‘তীল-সঠিক অর্থ প্রত্যাখ্যান থেকে বেশী খারাপ। কেননা (নসের) ব্যাখ্যা করা তাশবীহ, তা‘তীল এবং নসসমূহের সঙ্গে তামাশা করা ও তার প্রতি খারাপ ধারণা করাকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা আল্লাহর নাম ও সিফাতসমূহের হাকিকত অস্বীকার করার ক্ষেত্রে তা‘তীল ও তাবীলকারী একে অপরের শরীক। তবে নসকে নিয়ে তামাশা করা, তার সম্মান বিনষ্ট করা, তার সঙ্গে খারাপ ধারণা করা এবং এমন কথা যার বাহ্যিক অর্থ হলো ভ্রষ্টতা ও ভ্রষ্টকরা এর সঙ্গে বক্তাকে সম্পৃক্ত করার দিক থেকে তাবীলকারী একধাপ এগিয়ে। কাজেই তারা চারটি খারাপকে জমা করেছে: তাদের বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ ও তার রাসূলের কথার বাহ্যিক অর্থ অসম্ভব ও বাতিল। তারা প্রথমত তাশবীহ বুঝেছে, অতঃপর তারা তার থেকে দ্বিতীয় খারাপে গিয়েছে, আর তা হলো তা‘তীল, ফলে তারা তাদের বুঝ মোতাবেক নসের হাকিকতকে বাতিল করেছে যা তার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল নয় এবং আল্লাহর সঙ্গেও সামঞ্জস্যশীল নয়।

তৃতীয় খারাপী: পরিপূর্ণ ইলমের ধারক, পরিপূর্ণ স্পষ্ট বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা প্রদান করতে সক্ষম ও পরিপূর্ণ হিতাকাঙ্খীদেরকে স্পষ্ট ব্যাখ্যা, হিদায়াত ও সঠিক নির্দেশনার (অপবাদমূলক) বিপরীতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা... অথচ কোনো জ্ঞানীর নিকট সন্দেহ নেই যে,তাদের চেয়ে তাঁরা ছিলেন অধিক জান্তা,স্পষ্টভাষী ও মানুষের অধিক হিতাকাঙ্খীদের অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ খারাপী: তাদের নসের(ওহীর দলীলের) সঙ্গে তামাশা করা ও তার সম্মান বিনষ্ট করা। যদি তুমি নস(দলীল)কে এমন অবস্থায় দেখ যে, তারা তা তা চিবিয়ে বিকৃতি ঘটাচ্ছে এবং অপব্যাখ্যার তরঙ্গে তা নিয়ে খেলা করছে এবং তার ওপর কে বাড়িয়ে বলবে বাজারে অপব্যাখ্যাকারীরা ডাকাডাকি করছে, ফলে প্রত্যেকে তার মূল্য আদায়ে ইচ্ছামত ব্যাখ্যা পেশ করছে! যদি তুমি নসকে তাদের মাঝে এমন অবস্থায় দেখ যে সিফাত অস্বীকারকারীরা তার শুরুতে ও শেষে প্রত্যাখ্যান করার জন্যে তার রাস্তায় বসে পড়েছে। আর তারা বলছে, আমাদের ওপর তোমাদের কোনো রাস্তা নেই, যদিও থাকে সেটি হচ্ছে রূপক অর্থের রাস্তায়। কেননা আমরা যুক্তিবাদী ও দলিল সমৃদ্ধ আর তোমরা হলে শাব্দিক দলিল ও অহীর (নসের) বাহ্যিক রূপ, যা ইলম ও ইয়াকিনের ফায়দা দেয় না! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহু আকবার! তারা এই বেলচা দিয়ে ঈমানের কত আস্তানা বিনিষ্ট করেছে এবং তার দ্বারা কুরআন ও সুন্নাহের হাকিকতের কত দূর্গ বিকৃত করেছে! [৫০]

আর "তাফওয়ীধ"(দলীলের জটিল মর্ম আল্লাহর উপর সোপর্দ) কথাটি বিদআতিদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট কথার একটি। কারণ তাফওয়ীধ কথাটি কুরআনে চিন্তা করার দলিলসমূহের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং তার অনির্বায অর্থ হলো নবী ও রাসূলগণকে রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে মূর্খ বলা। আর জানা কথা যে, আল্লাহ আমাদেরকে কুরআনে চিন্তা করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা বুঝতে ও অনুধাবন করতে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন, তবু আমাদের থেকে কিভাবে তা না বুঝা, না শিখা ও না অনুধাবন করা উদ্দেশ্য হয়?!

অধিকন্তু যেই বক্তব্য দ্বারা আমাদের হিদায়েত করা, আমাদের জন্যে স্পষ্ট করা ও আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসা উদ্দেশ্য হয়, যদি তাতে উল্লেখিত বাহ্যিক বক্তব্য বাতিল ও কুফরি হয় এবং তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরিণ অর্থ আমাদের বুঝানো উদ্দেশ্য না হয়, অথবা আমাদেরকে বক্তব্যের ভেতরগত অর্থ বুঝানো

উদ্দেশ্য যা তাতে বর্ণনা করা হয়নি, তাহলে তো কোনো অবস্থাতেই আমাদের প্রতি বক্তব্যে থাকা হকের নির্দেশ দেয়া হলো না আর এই বক্তব্যের অর্থ বাতিল ও কুফর তাও আমরা জানলাম না।

(শরীয়ত প্রণেতার) আমাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তব্যে তাদের কথার হাকিকত হচ্ছে, তিনি হক বর্ণনা করেননি এবং তা স্পষ্টও করেননি, অথচ তা বিশ্বাস করার নির্দেশ আমাদেরকে দিয়েছেন। আর আমাদেকে যার দ্বারা সম্বোধন করেছেন এবং যার অনুসরণ করা ও যার দিকে প্রত্যাবর্তন করার নির্দেশ আমাদেরকে দিয়েছেন, তিনি তার দ্বারা হক স্পষ্ট করেননি এবং তা ব্যাখ্যাও করেননি, বরং তার বাহ্যিক কুফর ও বাতিল অর্থ বহন করে। আর তার কিছু না বুঝাই আমাদের থেকে চেয়েছেন, অথবা তিনি চেয়েছেন আমরা তার থেকে এমন কিছু বুঝি যার ওপর তাতে কোনো দলিল নেই। এগুলো এমন বিষয় যার ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, আল্লাহ এবং তার রাসূল তার থেকে পবিত্র। বস্তুত এসব বিকৃতকারী ও নাস্তিকদের কথাবার্তা” [৫১]

তাদের কথা মতে আল্লাহ তা‘আলা নবী ও রাসূলগণের ওপর এসব নস (অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস) থেকে যা কিছু নাযিল করেছেন তার অর্থ তারা নিজেরা, ফেরেশ্তাগণ ও পূর্ববর্তী মনীষীগণের কেউ জানেন না। এতে বিষয়টি এমন দাঁড়ায় যে, আল্লাহ নিজেকে কুরআনে যা দ্বারা গুণান্বিত করেছেন অথবা আল্লাহ নিজেকে যা দ্বারা গুণান্বিত করেছেন তার অধিকাংশ এমন যার অর্থ নবীগণ জানেন না, বরং তারা এমন কথা বলেন, যার অর্থ তারা নিজেরাই বুঝেন না...। আর স্বীকৃত যে, এটি কুরআন ও নবীদের ভেতর একটি কালিমা। কারণ, আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন এবং সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তা মানুষের জন্যে হিদায়েত ও সুস্পষ্ট বাণী বানিয়েছেন আর রাসূলকে তা সুস্পষ্টভাবে পৌঁছাতে ও মানুষদের নিকট যা নাযিল করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করে তাদেরকে বুঝাতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি কুরআনে চিন্তা করতে ও তা বুঝতে নির্দেশ দিয়েছেন, অধিকন্তু কুরআনে যা

রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো যা দ্বারা আল্লাহ নিজের সিফাতের সংবাদ দিয়েছেন… …অথচ তার অর্থ কেউ জানে না, ফলে তা বুঝা ও তাতে চিন্তা করা যায় না আর রাসূলও মানুষদের কাছে যা নাযিল করা হয়েছে তা বর্ণনা করেননি ও সুস্পষ্টভাবে পৌঁছাননি?! (এটিই তো তাফওয়ীধের অর্থ দাঁড়ায়)!

এই অবস্থায় প্রত্যেক নাস্তিক ও বিদআতি বলবে যে, আমি আমার বিবেক ও সিদ্ধান্ত দ্বারা যা জেনেছি তাই প্রকৃত সত্য। আর নসে এমন কিছু নেই যা তার বিপরীত, কেননা সেসব নস মুশকিল ও সাদৃশ্যপূর্ণ কেউ তার অর্থ জানে না। আর কেউ যার অর্থ জানে না তার দ্বারা দলিল পেশ করা বৈধ নয়। [৫২]

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃভালো ও মন্দ উভয়কে বিবেক নির্ণয় করে এমন বলা।

মাতুরীদিয়্যারা “ভালো ও মন্দ উভয়কে বিবেক নির্ণয় করে;আর বিবেক-ই বস্তুসমূহের ভালো ও মন্দ বুঝতে পারে বলে মনে করে।

তবে তারা কেবল বিবেকের সুন্দর ও অসুন্দর বুঝার দ্বারা কর্মে আল্লাহর বিধান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তাদের জমহুর গ্রহণ করেছেন যে, কতক কর্ম বাদে কতক কর্মে যেমন তাওহীদ ও রিসালতে অহীর জ্ঞান আসার আগে আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়,তবে গায়েব ও শরীয়ত অহীর ইলম ছাড়া মোটেই বুঝা যায় না।

আর তাদের কতক গ্রহণ করেছেন যে, বিবেক কর্মের যে সুন্দর ও অসুন্দর যা নির্ণয় করেছে , শরীয়ত আসা ছাড়া কেবল তার দ্বারাই আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে নিশ্চিত ফয়সালা দিতে পারে না।

ইবনুল হুমাম বলেনঃ “মুতাযিলারা যেভাবে কর্মের সুন্দর ও অসুন্দর সাব্যস্ত হওয়াকে বলেছেন, হানাফীরা ঠিক সেভাবেই বলেছেন। অতঃপর মুতাযিলারা যেই নীতির ওপর কর্মের জন্যে সুন্দর ও অসুন্দর সাব্যস্ত করা স্থির করেছেন, সকল হানাফী তা প্রত্যাখ্যান করেছেন,যেমন অধিক উপযুক্তই ওয়াজিব, রিযক ওয়াজিব, ইবাদতের ওপর সাওয়াব প্রদান করা ওয়াজিব আর জীব-জন্তু ও শিশুদের কষ্ট দেওয়ার বিপরীতে বিনিময় দেওয়া ওয়াজিব।

আর তারা দ্বিমত পোষণ করেছেন যে, কোনো কর্মে সুন্দর ও অসুন্দর সাব্যস্ত হওয়ার ইলমের ভিত্তিতে কী ওই কর্মে তাকলিফীভাবে আল্লাহর হুকুম জানা যাবে? উস্তাদ আবূ মানসূর ও সামারকান্দের অধিকাংশ শায়েখ বলেন, হ্যাঁ, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও তাকে সম্মান করা ওয়াজিব এবং যা খারাপ তার সঙ্গে তা

সম্পৃক্ত করা হারাম অনুরূপ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যারোপ করা ওয়াজিব। আর তাই হলো নি'আমতদাতার প্রতি শোকরের অর্থ।

আর মাতুরীদিয়্যাদের মধ্য থেকে বুখারার ইমামগণ বলেন, নবীগণের প্রেরণ করার আগে ঈমান ওয়াজিব নয় আর কুফর হারাম নয়। কেননা এমন অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ ঈমানের নির্দেশ দিবেন না এবং তার ওপর সাওয়াবও দিবেন না, যদিও তা সুন্দর। আর আল্লাহু সুবহানাহু কুফর থেকে নিষেধ করবেন না এবং তার ওপর শাস্তিও দিবেন না, যদিও তা খারাপ-অসুন্দর। মুদ্দা কথা হচ্ছে, বিবেকের দৃষ্টিতে ইবাদতের নির্দেশ না দেওয়া অসম্ভব নয়, কেননা আল্লাহ ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন আর পাপের দ্বারাও ক্ষতিগ্রস্ত হন না।" [৫৩]

আর মাতুরীদিয়্যাদের কথা "সুন্দর ও অসুন্দর দু'টোই বিবেকি" এর কারণ হলো, তাদের নিকট বিবেক হলো জ্ঞানের মূল। এ জন্য এটি অহীরও মূল এবং বিরোধের সময় তা অহীর ওপর অগ্রণী হয় [৫৪]।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ সুন্দর ও অসুন্দরের মাসআলায় সঠিকটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "বক্তব্য এবং শরীয়ত থেকে হাসিলকৃত হিকমত থেকে তিন প্রকার (কর্ম) সাব্যস্ত হয়েছে:

তার প্রথমটি হলো: কর্মটি মঙ্গল অথবা অমঙ্গলকে অন্তর্ভুক্ত করবে, যদিও তার সম্পর্কে শরীয়ত বর্ণিত হয়নি, যেমন জানা যায় যে, ইনসাফ জগতের শান্তিকে শামিল করে আর যুলম জগতের অশান্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই প্রকারটি হলো হাসান ও কবীহ (সুন্দর ও অসুন্দর)। কখনো বিবেক ও শরীয়ত দ্বারা তার খারাবি জানা যায়, তার মানে এই নয় যে, সে কর্মের জন্যে এমন সিফাত সাব্যস্ত করেছে যা তাতে ছিল না। কিন্তু এই খারাবি পাওয়া যাওয়ার কারণে জরুরি হয়

না যে, তার সংগঠনকারী আখিরাতে শাস্তি প্রাপ্ত হবেন, যদি তার ব্যাপারে শরীয়ত বর্ণিত না হয়। এই বিষয়ে সুন্দর ও অসুন্দরের কট্টর কথকেরা ভুল করেছেন। কেননা তারা বলেছেন, বান্দাদেরকে তাদের খারাব কর্মের কারণে শাস্তি দেয়া হবে, যদিও তাদের নিকট রাসূল প্রেরিত না হয়। আর এটিই হলো নসের বিপরীত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿...وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا ١٥﴾ [الإسراء: 15]

(আর আমি রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আযাবদাতা নই।) [আল-ইসরা: ১৫] **আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ**

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهۡلِكَ ٱلۡقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبۡعَثَ فِيٓ أُمِّهَا رَسُولٗا يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِنَاۚ وَمَا كُنَّا مُهۡلِكِي ٱلۡقُرَىٰٓ إِلَّا وَأَهۡلُهَا ظَٰلِمُونَ ٥٩﴾ [القصص: 59]

(আর আপনার রব কোনো জনপদকে ধ্বংস করেন না, যতক্ষণ না তিনি তার মূল ভূখন্ডে রাসূল প্রেরণ করেন, যে তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে। আর কোনো জনপদের অধিবাসীরা যালিম না হলে আমি তাদেরকে ধ্বংস করি না।) [আল-কাসাস : ৫৯] আল্লাহ রিসালাত প্রেরণ করা ছাড়া শাস্তি প্রদান করেন না মর্মে অনেক দলিল রয়েছে, যা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করে, সুন্দর ও অসুন্দর (বিবেকী) কথকদের মধ্য থেকে যারা বলেন, পৃথিবীতে মাখলুকের নিকট রাসূল প্রেরণ করা ছাড়াই তারা শাস্তি প্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় প্রকার: শরীয়ত প্রণেতা যখন কোনো জিনিসের আদেশ করেন তখন তা সুন্দর হয়ে যায়। আর তিনি যখন কোনো জিনিস থেকে নিষেধ করেন তখন তা অসুন্দর হয়ে যায়। বস্তুত কর্মটি সুন্দর ও অসুন্দর বিশেষণ শরীয়ত প্রণেতার বক্তব্য থেকে হাসিল করেছে।

তৃতীয় প্রকার: শরীয়ত প্রণেতা বান্দা তার আনুগত্য করে না তার নাফরমানি করে পরীক্ষা করার জন্যে কোনো জিনিসের আদেশ করবেন, আদিষ্ট কাজটি সম্পন্ন করা উদ্দেশ্য হবে না। যেমন ইবরাহীমকে তার সন্তান যবেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন, যখন তারা উভয়ে মেনে নিল এবং তাকে উপূড় করে শুইয়ে দিল, তখন উদ্দেশ্য হাসিল হল, ফলে যবেহর দ্বারা তার ফিদিয়া দিলেন। অনুরূপভাবে শ্বেত রোগী, কুষ্ঠ ও অন্ধের ঘটনা। যখন তাদের নিকট সদকা চাওয়ার জন্যে লোক পাঠালেন এবং যখন অন্ধ ব্যক্তি সাড়া দিল, তখন "ফেরেশ্তা বললেন, তোমার মাল তোমার কাছেই রাখ, তোমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছো, তোমার ওপর তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তোমার দুই সাথীর ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।" [৫৫]

হিকমতের উৎস হলো নির্দেশ (আমর) থেকে যে জিনেসের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে তার থেকে নয়। মুতাযিলারা (সুন্দর ও অসুন্দরের) এই প্রকার ও তার পূর্বের প্রকার বুঝেনি। তারা ধারনা করেছে যে, সুন্দর ও অসুন্দর কেবল তাই হয় যা তার দ্বারা গুণান্বিত, তাতে শরীয়তের নির্দেশের কোনো দখল নেই। আর আশআরীরা দাবি করেছে যে, পুরো শরীয়ত এক প্রকার পরীক্ষা। কর্মসমূহের কোনো বিশেষণ নেই, না শরীয়তের পূর্বে আর না তার সঙ্গে। আর জমহুর ও বিদ্যানগণ তিন প্রকারই সাব্যস্ত করেছেন আর তাই হলো সঠিক।" [৫৬]

দ্বিতীয় অধ্যায়: আল্লাহর প্রতি ঈমান।

এতে পাঁচটি পরিচ্ছেদ রয়েছেঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ: তাদের নিকট দলিলের পূর্বে আকল-বিবেক দ্বারা আল্লাহর পরিচয় হাসিল করা ওয়াজিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃমুকাল্লিদের(অন্ধঅনুসারীর) ঈমান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ-আল্লাহর কর্মসমূহের তাওহীদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ-ইবাদতসমূহের তাওহীদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত- আল্লাহর নাম ও সিফতের তাওহীদ।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ তাদের নিকট দলিলের পূর্বে আকল-বিবেক দ্বারা আল্লাহর পরিচয় হাসিল করা ওয়াজিব।

মাতুরীদিয়্যাদের নিকট অহীর দলিল আসার আগেই কেবল বিবেক দ্বারা আল্লাহর মারেফাত হাসিল করা ওয়াজিব। কেননা নবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করার আগেই মানুষ এই মারেফাত হাসিল করার দায়িত্ব ধারন করে আসছে। কাজেই তা পরিত্যাগ করে ছাড় পাবে না,বরং তা পরিত্যাগ করার ওপর তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

তাদের কেউ কেউ বিবেকবান বাচ্চার ওপর বিবেক দ্বারা আল্লাহর মারেফাত হাসিল করা ওয়াজিব করেছেন।

আবুল মুয়ীন আন-নাসাফী বলেনঃ “যার নিকট অহী পৌঁছল না অথচ সে বিবেকবান এবং সে তার (বিবেক দ্বারা) রবকে চিনল না,সে অপারগ গণ্য হবে কিনা? আমাদের নিকট সে অপারগ গণ্য হবে না, তার ওপর ওয়াজিব, জগতের জন্যে অবশ্যই একজন স্রষ্টা রয়েছেন গবেষণা করে বের করা।” [৫৯]

এই মাসআলায় হক ও সত্য হলো আল্লাহর মারেফাত (পরিচয়) অন্তরের ভেতরকার এক জন্মগত প্রকৃতি। বিবেক এবং অহীর জ্ঞানও তার ওপর প্রমাণ বহন করে। আর যখনই সংশয় বা প্রবৃত্তি জনিত কারণে তার ওপর প্রমাণ পেশ করা প্রয়োজন হবে তখন তা পেশ করা ওয়াজিব হবে। "কুরআনও তার ওপর প্রমাণ পেশ করে, কারণ কুরআন তাওহীদের ওপর দলিল ও যুক্তি-বিবেকের প্রমাণনাদি উল্লেখ করে এবং বিবেক ও জন্মগত স্বভাবের নিরিখে তাওহীদের সৌন্দর্য ও শিরকের কদর্যতা বর্ণনা করে এবং তাওহীদের নির্দেশ দেয় ও শিরক থেকে নিষেধ করে। এই জন্যেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বহু উদাহরণ পেশ করেছেন, যেগুলো হলো বিবেকি দলিল। আর তার দ্বারা বান্দাদেরকে সম্বোধন করেছেন এমন ব্যক্তিকে সম্বোধন করার ন্যায় যাদের অন্তরে ও জন্মগত স্বভাবে তাওহীদের সৌন্দর্য ও তা ওয়াজিব হওয়া এবং শিরকের কদর্যতা ও তা নিন্দনীয় হওয়া স্থির হয়ে গেছে। বস্তুত তা প্রমাণকারী বিবেকি দলিলে কুরআন পরিপূর্ণ, যেমন আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَٰكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلۡ يَسۡتَوِيَانِ مَثَلًاۚ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٢٩﴾ [الزمر: 29]

(আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন: এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, যারা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং আরেক ব্যক্তি, যে এক প্রভুর অনুগত; এ দু'জনের অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।) [আয-যুমার:২৯] তাঁর আরো বাণীঃ

﴿۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبۡدًا مَّمۡلُوكًا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٖ وَمَن رَّزَقۡنَٰهُ مِنَّا رِزۡقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنۡهُ سِرًّا وَجَهۡرًاۖ هَلۡ يَسۡتَوُۥنَۚ ...﴾ [النحل: 75]

(আল্লাহ্ উপমা দিচ্ছেন অন্যের অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোনো কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে উত্তম রিযক দান করেছি এবং সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; তারা কি একে অন্যের সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য; বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।) [আন-নাহল:৭৫] **তাঁর আরো বাণীঃ**

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٞ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥٓۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخۡلُقُواْ ذُبَابٗا وَلَوِ ٱجۡتَمَعُواْ لَهُۥۖ وَإِن يَسۡلُبۡهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيۡـٔٗا لَّا يَسۡتَنقِذُوهُ مِنۡهُۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلۡمَطۡلُوبُ ٧٣﴾ [الحج: 73]

(হে মানুষ! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগের সাথে তা শোন: তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এ উদ্দেশ্যে তারা সবাই একত্র হলেও এবং মাছি যদি কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের কাছ থেকে, এটাও তারা তার কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। যে সাহায্য চায় সেও দুর্বল এবং যার কাছে সাহায্য চাওয়া হয় সেও দুর্বল;) [আল-হাজ্ব : ৭৩-৭৪] **এর সঙ্গে আরও অনেক তাওহীদের বিবেকি দলিল রয়েছে। কুরআন যার নির্দেশনা দিয়েছে ও যার ওপর সচেতন করেছে। তবে এখানে আরেকটি বিষয় রয়েছে, আর তা হলো এই ফরজ ত্যাগ করার শাস্তি শরিয়ত না আসা পর্যন্ত বিলম্ব হবে। যেমন তার ওপর প্রমাণ বহন করেছে আল্লাহর বাণী:**

﴿... وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا ١٥﴾ [الإسراء: 15]

(আর আমি রাসূল প্রেরণ করার আগ পর্যন্ত শাস্তি প্রদানকারী নই।) [আল-ইসরা: ১৫] **তার আরো বাণীঃ**

﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِۖ كُلَّمَآ أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾ قَالُوا۟ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾﴾ [الملك: 8-9]

(রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে, যখনই তাতে কোনো দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে, 'তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী আসেনি?' (৮) তারা বলবে, 'হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল, তখন আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম, 'আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি, তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে রয়েছ।' (৯) [আল-মুলক: ৮-৯] **আর এমনটি কুরআনে অনেক রয়েছে, যা খবর দেয় যে, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের কারণেই তাদের ওপর প্রমাণ সাব্যস্ত হয়েছে, যেমনিভাবে তাদের অন্তরে ও জন্মগত স্বভাবে থাকা তাওহীদ ও শোকরের সৌন্দর্য এবং শিরক ও কুফরের কদর্যতা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করেছে। [৬০]**

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ
মুকাল্লিদের(অন্ধঅনুসারীদের) ঈমানের হুকুম।

মাতুরীদিয়্যারা যখন বলল , আল্লাহর মারেফাতের জন্যে গবেষণা করা ও যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ পেশ করা ওয়াজিব, তখন তাদের জমহুর (অধিকাংশ) মনীষীগণ গ্রহণ করল যে, যে ব্যক্তি ঈমান আনল কিন্তু গবেষণা ও যুক্তি-প্রমাণ পেশ করল না তার ঈমান সহীহ হবে, তবে সে গবেষণা ও যুক্তি-প্রমাণ ত্যাগ করার কারণে পাপী হবে। আর তাদের কতক গ্রহণ করল যে, সে হবে মুকাল্লিদ (অন্ধঅনুসারী), কাজেই সে গবেষণা ও দলিল ত্যাগ করার কারণে পাপী হবে না।

নাসিরী বলেনঃ "ইমাম সাইফুল হক আবুল মুয়ীন বলেন, অতঃপর মাযহাব হলো, যে মুকাল্লিদের সঙ্গে দলিল নেই সে মুমিন হবে আর তার জন্যে ইসলামের হুকুম আবশ্যক হবে। সে তার বিশ্বাস ও সকল ইবাদত দ্বারা আল্লাহর আনুগত্যকারী বিবেচিত হবে, যদিও সে গবেষণা ও যুক্তি-প্রমাণ পেশ না করার কারণে পাপী হবে। আর তার বিধান হলো মুসলিম মিল্লাতের অনুসারী অন্যান্য ফাসিকদের বিধানের মত।" [৬১]

আর যারনুযি বলেন: "মুকাল্লিদের ঈমান যদিও আমাদের নিকট সহীহ, তবে যুক্তি-প্রমাণ ত্যাগ করার কারণে সে পাপী হবে।" [৬২]

এই মাসআলায় সঠিক মত হচ্ছে, যেখানে দৃঢ়তা উদ্দেশ্য হয় সেখানে দৃঢ়তা পাওয়া গেলেই যথেষ্ট হবে, যদিও তা তাকলীদের পদ্ধতিতে হয়। অতএব আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশ্তাদের প্রতি এবং কিতাবসমূহ, রাসূলগণ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এমন বিষয় যেখানে দৃঢ়তা পোষণ করা ওয়াজিব, কিন্তু মূর্খ ব্যক্তি তার প্রমাণসহ তা আয়ত্তে আনতে পারে না, তবুও আমরা তার ঈমানকে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করব। আমরা বলব,নিশ্চয় সে মুমিন,যদিও সে তার প্রমাণসহ তা আয়ত্তে আনতে পারে না। এর দলিল হলো,আল্লাহ তাআলা দীনের মাসআলাসমূহের মধ্যে যেখানে দৃঢ়তা উদ্দেশ্য হয়,সেখানে আলেমদেরকে প্রশ্ন করার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۖ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ٧﴾ [الأنبياء: 7]

(আর আপনার আগে আমি ওহীসহ পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম; সুতরাং যদি তোমরা না জান তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর।) [আল-আম্বিয়া : 7।] আর স্পষ্ট যে, আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করি যেন তাদের কথা গ্রহণ করতে পারি। আরো জানা কথা যে, রাসূলগণ

হলেন পুরুষ এটাও আকিদার বিষয়। তা সত্ত্বেও আল্লাহ এবিষয়ে আমাদেরকে আলেমদের কাছে সোপর্দ করেছেন। অতঃপর আমরা যদি সাধারণ মানুষকে অনুকরণ ছাড়তে ও ইজতিহাদ আঁকড়ে ধরতে বাধ্য করি, তাহলে অবশ্যই আমরা তার ওপর এমন বিষয়কে আবশ্যক করব সে যার সাধ্য রাখে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ ...﴾ [البقرة: 286]

"আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না।" [আল-বাকারাহ: ২৮৬] এবং তিনি বলেন,

﴿أُوْلَٰٓئِكَ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِ وَهُمۡ لَهَا سَٰبِقُونَ ٦١ وَلَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ ...﴾ [المؤمنون: 61-62]

"তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তারা তাতে অগ্রগামী হয়। আর আমি কোনো নফসকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেই না।" [আল-মুমিনুন: ৬১-৬২] [৬৩]

আর মুকাল্লিদের ঈমান বাতিল হওয়ার ধারনা পোষণকারীদের ওপর আরো আপতিত হয় যে, সাহাবীগণ অধিকাংশ অনারব দেশ জয় করেছেন এবং সেখানকার সাধারণের ঈমানকে আরবদের সাধারণ লোকের ঈমানের মতই গ্রহণ করেছেন। যদিও তারা ঈমান এনেছে তলোয়ারের চাপে অথবা তাদের বড়দের থেকে যারা ঈমান গ্রহণ করেছেন তাদের অনুসরণ করে। অথচ তারা তাদের কাউকে চিন্তা-গবেষণার নির্দেশ দেননি এবং তাকে তার সত্যতার প্রমাণ জিজ্ঞেস করেননি আর চিন্তা-গবেষণা করা পর্যন্ত তার বিষয়টি বিলম্বও করেননি।" [৬৪]

নববী রাহিমাহুল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: (আমি মানুষদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা

সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই...) এর ব্যাখ্যায় বলেন, [৬৫] এতে মুহাক্কিক এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জমহুর আলিমদের মাযহাবের ওপর স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, মানুষ যখন দৃঢ় বিশ্বাস করে যাতে কোনো সন্দেহ থাকে না তাই তার জন্যে যথেষ্ট হবে। সে তাওহীদপন্থী মুমিন হবে। তার ওপর মুতাকাল্লিমদের (তর্কশাস্ত্রবিদদের) দলিল শিখা ও তার দ্বারা আল্লাহর মারেফাত হাসিল করা ওয়াজিব হবে না। এ মতটি তার বিপরীত যে তা ওয়াজিব করেছে এবং আহলে কিবলা হওয়ার জন্যে তা শর্ত বানিয়েছে আর ধারনা করেছে যে, এটি ছাড়া তার জন্যে মুসলিমদের হুকুম (বিধান) সাব্যস্ত হবে না। এ মাযহাবই হলো,অনেক মুতাযিলা ও আমাদের কতক মুতাকাল্লিম(তর্কশাস্ত্রবিদ)সঙ্গীদের কথা। এটি স্পষ্ট ভুল। কেননা দৃঢ় বিশ্বাস হলো উদ্দেশ্য আর তা হাসিল হয়েছে। অধিকন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাকে যথেষ্ট করেছেন, প্রমাণসহ জানাকে শর্ত করেননি। এ প্রসঙ্গে বুখারী ও মুসলিমে অনেক হাদীস রয়েছে, যার সমষ্টি দ্বারা হাদীসগুলোর মুতাওয়াতির হওয়া সাব্যস্ত হয় ও নিশ্চিত ইলম হাসিল হয়।” [৬৬]

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ- আল্লাহর কর্মসমূহের তাওহীদ।

মাতুরীদিয়্যাদের নিকট তাওহীদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো,আল্লাহর একত্বের বিশ্বাস, তাদের নিকট যা নেতিবাচক গুণ এবং তা তিন প্রকার বলা হয়:

প্রথম: আল্লাহর সত্ত্বার ক্ষেত্রে একত্ব। এর দ্বারা তারা আল্লাহ তাআলার যাত (সত্ত্বা) থেকে আধিক্কতাকে নাকচ করা উদ্দেশ্য গ্রহণ করেন। এই অর্থে যে, তার সত্ত্বা বিভাজন কবুল করে না। ফলে তারা বলেন, তিনি তার সত্ত্বায় এক তার কোনো ভাগ নেই। আর তারা

দলীলসমূহে আল্লাহ সম্পর্কে বর্ণিত "আহাদ" শব্দের ব্যাখ্যা এই অর্থ দ্বারাই করেন। তারা আল্লাহ তাআলার বাণী,

﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١﴾ [الإخلاص: 1]

"বল, তিনি আল্লাহ একক।" এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ এক, অর্থাৎ আল্লাহ এক অস্তিত্বশীল, তার কোনো অংশ নেই এবং তার সত্ত্বার কোনো ভাগ নেই। [৬৭]

দ্বিতীয়:আল্লাহর সিফাতসমূহের একত্বঃ এর উদ্দেশ্য হলো, যেমন তারা বলেন, আল্লাহর সিফাতসমূহে তাঁর উপমা না থাকা। অতএব জানা জ্ঞান ও তার কর্তৃত্তাধীন বস্তুর আধিক্যের কারণে আল্লাহর একাধিক ইলম ও ক্ষমতা থাকা অসম্ভব। বরং তার ইলম এক, তবে তার জানা বিষয় অনেক অনুরূপভাবে তার কুদরত এক, তবে তার কুদরতাধীন বস্তু অনেক। এটি তার সকল সিফাতের ক্ষেত্রেই।

তারা পূর্বের দুই প্রকার দ্বারা (আল্লাহর) শরীর ও সাদৃশ্য না থাকা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আর তারা এই তাওহীদের নামের ক্ষেত্রে ঢুকিয়েছে, যার উপর তারা কিছু পরিভাষাও স্থির করেছেন।কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত হওয়া সিফাতকে তারা অসাব্যস্ত করেছেন। এ কারনেই তারা নিজেদের আকিদার মূলনীতি বানিয়েছে (আল্লাহর জন্য) শরীর, জাওহার, আরয প্রভৃতি বিদআতি শব্দ ও মর্মসমূহকে অসাব্যস্ত করাকে।[৬৮]

তৃতীয়: আল্লাহর কর্মসমূহের একত্ব। একে তাওহীদুল আফ'আল নামকরণ করা হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সাধারণভাবে সকল জগত সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার এক ও একক হওয়া এবং আল্লাহ ছাড়া কারো দিকেই সম্ভাব্য কোনো জিনিসের প্রভাবকে সম্পৃক্ত না করা।

আল্লাহ তা'আলার তাওহীদে তাদের সার কথা হলোঃ তিনি তাঁর সত্ত্বার ক্ষেত্রে এক, তাঁর কোনো ভাগ অথবা তাঁর কোনো অংশ নেই। তিনি তাঁর সিফাতসমূহে এক, তাঁর কোনো সাদৃশ্য নেই এবং তিনি তাঁর কর্মে এক তাঁর কোনো অংশী নেই। [৬৯]

আবূ মানসূর আল-মাতুরিদি الواحد (ওয়াহিদ) ও التوحيد (তাওহীদ)-এর অর্থ বর্ণনায় বলেনঃ "আল্লাহ এক তার কোনো সাদৃশ্য নেই, তিনি চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠিত তাঁর বিপরীত ও সমকক্ষ কিছু নেই। আর এটিই হচ্ছে আল্লাহর বাণীর ব্যাখ্যা:

﴿...لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ...﴾ [الشورى: 11]

"তাঁর মতো কোনো কিছু নেই"। [আশ-শূরা : ১১] তিনি সাদৃশ্য ও বৈপরীত্য মুক্ত একক হওয়ার কারণে এক। এ কারণে তাঁর ক্ষেত্রে শরীর ও আরযের কথা বলা বাতিল। কারণ শরীর ও আরয হলো বস্তুসমূহের বিশেষণ। যখন এটি সাব্যস্ত হল, তখন সেসব সিফাতকেও আল্লাহর সিফাত হিসেবে গণ্য করা বাতিল সাব্যস্ত হলো, যা মাখলুকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হলে ও যার দ্বারা মাখলুককে বিশেষত করা হলে যা বুঝা যায় আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও তাই বুঝা যায়।" [৭০]

তাওহীদ হলো,আল্লাহ তা'আলা রুবুবিয়্যাহ,উলুহিয়্যাহ ও আসমা ওয়াস সিফাত থেকে যার হকদার, তাতে তাকে একক করা। তাওহীদ তিনভাগে ভাগ হয়ঃ তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ,তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ ও তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত। অথবা দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ(1)তাওহীদু মা'রিফাহ ও ইসবাত: আর এটি হলো তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ ও তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের সমষ্টি।আর(2) হলো,তাওহীদু কাসদ,ইরাদাহ ও তলব: আর এটি হলো তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ [৭১],এই হলো মুসলিমদের আকিদা, যারা আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহতে বিশ্বাসী।

তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ দ্বারা উদ্দেশ্যঃ নিশ্চিত বিশ্বাস করা যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই স্রষ্টা, রিযিকদাতা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা এবং তিনিই তার সকল সৃষ্টির সকল বিষয় তদারককারী। এতে তার কোনো শরীক নেই।[৭২]

তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ[৭৩] দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিনয়, নতি স্বীকার, মুহাব্বাত, একাগ্রতা ও ইবাদতের সকল প্রকার দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে খাস করা, তার কোনো শরীক নেই।

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলোঃ কিতাব ও সুন্নাহে বর্ণিত আল্লাহর নাম ও সিফাতসমূহে সুদৃঢ় ঈমান পোষণ করা এবং তা আল্লাহর জন্যে সাব্যস্ত করা বিকৃতি, বাতিল করা, ধরন বর্ণনা করা বা সাদৃশ বর্ণনা করা ছাড়া।

মাতুরীদিয়্যারা মনে করে যে, আল্লাহর মারিফাত জন্মগত স্বভাব দ্বারা জরুরি মারিফাত পূর্ণ হয় না,বরং বিবেক দ্বারা অর্জন করা ছাড়া তা সম্ভবই নয়। এই জন্যে যে মূলনীতির ওপর তাদের আকিদার ভিত্তি তার একটি হচ্ছে, (বিবেক দ্বারা আল্লাহর মারিফাত হাসিল করা ওয়াজিব)। তার ওপর তারা গবেষণা ও যুক্তি-প্রমাণ পেশ করাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন এবং সেটিকে বান্দার ওপর প্রথম ওয়াজিব বানিয়েছেন।[৭৫] আর তাকেই তারা সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য ও সর্বোত্তম মাকসাদে পরিণত করেছেন এবং যে তা বাস্তবায়ন করবে সেই আল্লাহরএকত্বে বিশ্বাসী মুমিন।

তাদের তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ সাব্যস্ত করা দু'টি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল:

প্রথম: আল্লাহর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করা:মাতুরীদিয়্যারা বিশ্বাস করে যে, জগতের উপকরণ ছাড়া আল্লাহ তা'আলাকে চেনা যায় না। এ প্রসঙ্গে মাতুরীদী বলেনঃ "মূলনীতি হলো, ইন্দ্রীয় অথবা শ্রুত সাক্ষ্যের

মাধ্যমে আল্লাহর মারিফাত হাসিল করার তরিকা বাদে আল্লাহর অস্তিত্বের ওপর জগতের প্রমাণ পেশ করা ছাড়া তার ইলম হাসিল করার কোনো উপায় নেই।" [৭৬]

তাদের নিকট এই মারিফাত হয় জগতকে ক্ষণস্থায়ী সাব্যস্ত করার দ্বারা। অতঃপর তার দ্বারা তার স্রষ্টার অস্তিত্বের ওপর প্রমাণ পেশ করা।[৭৭]

দ্বিতীয়: আল্লাহ তা'আলার রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে তাঁর ওয়াহদানিয়্যাহ (একত্ব) সাব্যস্ত করা: মাতুরীদিয়্যারা মুতাকাল্লিমদের (তর্কশাস্ত্রবিদদের) নিকট প্রসিদ্ধ দলিল, যা "তামানু"'র (অসম্ভব হওয়ার) দলিল হিসেবে পরিচিত তার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার রুবুবিয়্যাতের ওপর একত্বের দলিল পেশ করেছেন। [৭৮]

তাদের নিকট তামানু' (পরস্পর প্রতিরোধ)-এর দলিলের স্বরূপ হচ্ছে, "যখন প্রমাণিত হল যে, জগতের একজন স্রষ্টা রয়েছেন যিনি তা সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর একজন নির্মাতা রয়েছেন যিনি তা নির্মাণ করেছেন, তাহলে সৃষ্টিকর্তা একজন সাব্যস্ত হলেন। কেননা তার জন্যে যদি দু'জন সৃষ্টিকর্তা হয় তাহলে পরস্পরের মাঝে প্রতিরোধের অবস্থা তৈরি হবে। আর এটি হচ্ছে দুই স্রষ্টা অথবা তাদের একজনের ক্ষণস্থায়ী হওয়ার দলিল। কেননা, তাদের একজন কারো ভেতর জীবন সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলে অপরজন তার ভেতরই মৃত্যু সৃষ্টি করতে চাইবেন। এভাবে বিপরীত মূখী সকল সিফাতের বেলায় ঘটবে, যেমন নড়াচড়া ও স্থির থাকা, একত্র হওয়া ও বিচ্ছিন্ন হওয়া, কালো ও সাদা প্রভৃতি। হয়তো তাদের উভয়ের উদ্দেশ্য হাসিল হবে এবং বিপরীত মূখী দু'টি বস্তু একই স্থানে পাওয়া যাবে। আর এটি অসম্ভব। অথবা তাদের উভয়ের চাওয়াই উঠে যাবে, কোনটাই কার্যকর হবে না এবং এটা ওটা কোনোটাই পাওয়া যাবে না। তাহলে এটি হল তাদের উভয়ের অক্ষম হওয়ার প্রমাণ। আর যদি তাদের একজন বাদে

অপরজনের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয় তাহলে যার ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়নি, তার ভেতর অক্ষমতা পাওয়া গেল আর এই অক্ষমতাই হচ্ছে তার ক্ষণস্থায়ী হওয়ার আলামত। কাজেই যখন জগতের জন্যে আদি স্থায়ী দু'জন স্রষ্টা কল্পনা করা যায় না, তখন নিশ্চিতভাবে একজন স্রষ্টা প্রমাণিত হল।" [৭৯]

দু'জন স্রষ্টার পক্ষ থেকে জগত সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব তার পূর্ণ প্রমাণ ও সহীহ দলিল এটি[৮০], তবে মাতুরিদের বিশ্বাস যে, আল্লাহ তাআলার বাণী

﴿لَوۡ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ ...﴾ [الأنبياء: 22]

এর দ্বারা এই দলিলই উদ্দেশ্য। এটি তাদের বাতিল আকিদা এবং আল্লাহর কালামের ভুল বুঝ। আর তাদেরকে এরূপ বলতে বাধ্য করেছে তাদের বিশ্বাস যে, ইলাহ হলো আলিহা অর্থ প্রদানকারী ইসমুল ফায়িল। আর উলুহিয়্যাহ হলো, সৃষ্টি করার ক্ষমতা[৮১]

অতএব তাদের নিকট ইলাহ হলো রবের অর্থ প্রদানকারী। আর আয়াতটি শুধু দু'জন রব না থাকার প্রমাণ বহন করে। আর তা হলো দু'জন রব থেকে কর্ম পাওয়া যাওয়া পরস্পর প্রতিরোধ হওয়ার ভিত্তিতে। কাজেই তাদের নিকট আয়াতটি শুধু রুবুবিয়্যাতে শিরক না থাকাকে বুঝায়। আর তাই হলো পরস্পর প্রতিরোধ হওয়ার দলিলের উদ্দেশ্য। অথচ আয়াতটি এর চেয়ে মহান ও পরিপূর্ণ অর্থ প্রদান করে। অধিকন্তু কোনো আদম সন্তান জগতের জন্যে দু'জন রব সাব্যস্ত করেনি। বস্তুত জগতে শিরক সংঘঠিত হয়েছে কতক মাখলুককে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের মাখলুক সাব্যস্ত করার ফলে। আর উলুহিয়্যাতে (শিরক সংঘঠিত হয়েছে) আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করা,অন্যকে মাধ্যম স্থির করা, তাদেরকে আহ্বান করা ও তাদের নৈকট্য হাসিল করা। কিন্তু কোনো মানুষ জগতের জন্যে

সমান ক্ষমতাধর দু'জন রব সাব্যস্ত করার দিকে যায়নি। আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

﴿وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ ...﴾ [الزمر: 38]

(তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, আসমানসমূহ ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।) [আয-যুমার: ৩৮]

অতএব আয়াতের উদ্দেশ্য ও মাতুরীদিয়্যাদের তামানু‘র (পরস্পর প্রতিরোধ)দলিলের উদ্দেশ্যের মাঝে বিস্তর ফারাক-। কারণ, আয়াতের উদ্দেশ্য হলো যদি আল্লাহ তা‘আলার সঙ্গে অন্য কাউকে ইবাদতের উপযুক্ত পাওয়া যেত তাহলে জগত ধ্বংস হয়ে যেত দ্বারা তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ সাব্যস্ত করা। পক্ষান্তরে তামানু‘র দলিলের উদ্দেশ্য হলো যদি জগতের জন্যে দ্বিতীয় স্রষ্টা পাওয়া যেত, তাহলে জগত ধ্বংস হয়ে যেত দ্বারা তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ সাব্যস্ত করা।

যেমনিভাবে মাতুরীদিয়্যারা অন্যান্য আলামত দ্বারা (তাওহীদুর রুবুবিয়্যার ওপর) দলিল পেশ করেছেন, যেমন জগত ধ্বংস হওয়া, নবী ও রাসূলদের মুজিযা, জগতের মজবুতভাবে শৃঙ্খলিত থাকা ও তার সূক্ষ্ম নির্মাণ শৈলী। মাতুরিদী আত-তাওহীদ কিতাবে নিম্নের বাণী দ্বারা এটি স্পষ্ট করেছেনঃ “জগতের স্রষ্টা একজন তার প্রমাণ হলো, সর্বসম্মত কথা যে, ওয়াহিদ (এক) হলো গণনা শুরু করার ইসম (এককের নাম)। এবং বড়ত্ব, কর্তৃত্ব, মর্যাদা ও শ্রেষ্টত্বেরও নাম। যেমন বলা হয়, অমুক যুগের একক ব্যক্তি এবং বড়ত্ব, মর্যাদা ও উচ্চতায় অদ্বিতীয়। আর যা একেকে অতিক্রম করে তা সংখ্যা ছাড়া (সম্মান ও মর্যাদা) কিছুই ধারন করে না। অতএব জগতের অসংখ্য হওয়া আবশ্যক হয় (কারণ, সংখ্যা অসংখ হলে সংখ্যা দ্বারা গণনাকৃত বস্তু অসংখ্য হবে)। কারণ, যদি সংখ্যাসমূহ থেকে প্রত্যেক সংখ্যা একক সত্ত্বা হয়, তাহলে জগতসমূহ সসীম হওয়ার বাইরে চলে যাওয়ার কারণে সংখ্যাসমূহও তার মত হবে (কারণ, এককে জগতের

বিপরীতে একেক সংখ্যা থাকবে)। আর তা তো দূরস্থান। অতঃপর ইশারা করা যায় এমন কোনো সংখ্যা নেই, যেখানে বৃদ্ধি ও হ্রাস করার দাবি করা যায় না। অতএব (ওয়াহিদ ছাড়া) কোনো সংখ্যার ক্ষেত্রে বলা ওয়াজিব হল না যে, তাতে অন্য কেউ অংশী নয়। কেননা সংখ্যার ক্ষেত্রে এরূপ বলার কোনো যৌক্তিকতা নেই (কেননা, ওয়াহিদ ছাড়া প্রত্যেক সংখ্যার ওপর হ্রাস-বৃদ্ধির দাবি করা যায়)। কাজেই একের অধিক ইলাহ কল্পনা করা বাতিল সাব্যস্ত হল”(৮২)।

আর তিনি নবী ও রাসূলদের মুজিযা এবং জগতের সুশৃঙ্খল হওয়া দ্বারা দলিল পেশ করে বলেন, “আহলে তাওহীদগণ যেই ইলাহকে চেনেন তিনি ছাড়া অন্য মাবূদ থেকে উলূহিয্যার দাবি উল্লেখ করা হয়নি। আর তার থেকে তার কর্মের কোনো প্রভাবের দিকে ইশারা পাওয়া যায়নি, যা তার রব হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কোনো জিনিসেও (ইলাহ হওয়ার) এমন অর্থ পাওয়া যায়নি, যা তাকে তার ন্যায় অন্যান্য জিনিস থেকে আলাদা করে দিয়েছে। অধিকন্তু আল্লাহ ব্যতীত কেউ রাসূলদেরকে এমন আলামত দিয়ে পাঠননি, যা বিবেককে পরাস্ত করে ও বিবেক তার জন্যে অভিভূত হয়। অতএব প্রমাণিত হল যে, একের অধিক ইলাহ থাকার কথা বলা কেবল ধারনা ও কল্পনা মাত্র।

আর রাসূলগণের নিদর্শন নিয়ে আগমন করা যা কেউ দেখলে স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, এটি এমন সত্ত্বার কর্ম, যদি তার সঙ্গে কোনো শরীক থাকত তাহলে সে অবশ্যই তাদেরকে তা প্রকাশ করতে বাধা দিত। কারণ এর দ্বারা তাদের রুবুবিয়্যাহ ও উলূহিয়্যাহ বাতিল হওয়া রয়েছে। কাজেই যখন শরীক পাওয়া গেল না এবং তাদেরকে তা প্রকাশ করতে বাধাও দেয়া হল না, অথচ তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতাকারী ও তাদের সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণকারীর সংখ্যা অনেক ছিল, তারা যদি নিজেদের নিদর্শন প্রকাশ করতে সাহায্যকারী চাইতেন তাহলে অবশ্যই তারা তা পেয়ে যেতেন। অতএব সাব্যস্ত হল

যে, সত্য ইলাহ ও মাখলুক সৃষ্টিকারী পরাক্রমশালী এক ইলাহ ছাড়া কোনো ইলাহ না থাকায় রাসূলদের জন্যে মুজিযা প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়েছে। যিনি প্রত্যেক দাম্ভিককে চোখ তুলে তাকাতে দেননি, বাস্তবায়ন তো দূরস্থান।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ।

মাতুরীদিয়্যারা তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ নিয়ে কোনো আলোচনা করেনি এবং তাদের কেউ তা বুঝেওনি, অথচ এটিই হলো দীনের মূল এবং নবী ও রাসূলগণের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ দাওয়াত। এই তাওহীদ নিয়েই রাসূলগণ এসেছেন এবং তাদের কওমকে তার দিকেই আহ্বান করেছেন। কাজেই রাসূলগণ তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহকে সাব্যস্তকারী, এবং তাওহীদুল উলূহিয়্যাহর দিকে আহ্বানকারী ছিলেন, যেমন আল্লাহ তাদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। [৮৪], আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥﴾ [الأنبياء: 25]

"আর তোমার পূর্বে এমন কোনো রাসূল আমি পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, 'আমি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো।" [আল-আম্বিয়া ২৫]
আল্লাহ তা'আলা নূহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

﴿وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوۡمِهِۦٓ إِنِّي لَكُمۡ نَذِيرٞ مُّبِينٌ ٢٥ أَن لَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَۖ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ أَلِيمٖ ٢٦﴾ [هود: 25-26]

"আর অবশ্যই আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, ' নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী,' (২৫) 'যেন তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর 'ইবাদত না কর ;

আমি তো তোমাদের জন্য এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির আশংকা করি।' (২৬) [হূদ: ২৫-২৬] আল্লাহ তা'আলা হূদ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓۖ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۝٥٠﴾ [هود: 50]

'আর আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা একমাত্র আল্লাহর 'ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো সত্য ইলাহ্ নেই। তোমরা তো শুধু মিথ্যা রটনাকারী। [হূদ: ৫০] [৮৫]

মাতুরীদিয়্যারা তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ ও তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহর মাঝে পার্থক্য করেনি, বরং তারা ইলাহিয়্যাহ ও রুবুবিয়্যাহর অর্থে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। তারা ধারনা করেছে যে, ইলাহিয়্যাহর অর্থ হচ্ছে সৃষ্টি করার ক্ষমতা। এ জন্যেই তারা বিশ্বাস করেছে যে, তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহই হলো আল্লাহ তা'আলার নিম্নের বাণীর উদ্দেশ্য:

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ ...﴾ [الأنبياء: 22]

"যদি তাতে আল্লাহ ছাড়া অনেক ইলাহ হত তাহলে উভয় ধ্বংস হয়ে যেত।" [আল-আম্বিয়া: ২২] এবং আরো এই জাতীয় অন্যান্য আয়াত। আর তারা ধারনা করেছে যে, তাওহীদ—যা বান্দার ওপর আল্লাহর হক—দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ। তা হচ্ছে এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ একাই জগত সৃষ্টি করেছেন। আর ধারনা করেছে যে, যখন তারা দলিল দ্বারা এটি সাব্যস্ত করল, তখন তারা তাওহীদের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করল। আর যে এটি নিয়ে আসল সে আল্লাহর

জন্যে তার দীনকে খালিস করে নিল এবং সে তাওহীদ পন্থী মুমিন হয়ে গেল। [৮৬]

আর এই জন্যে তাদের চূড়ান্ত প্রচেষ্টা ছিল তাওহীদুস সিফাত ও তাওহীদুল আফ‘আল অর্থাৎ তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ নিয়ে [৮৭]। তাদের নিকট তাওহীদুল আফ‘আল হলো তাওহীদের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ প্রকার। এটিই হচ্ছে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ ও আল-খালিকিয়্যাহ। এই অর্থে যে, আল্লাহ তা‘আলা একাই জগতের স্রষ্টা। তারা ধারনা করে যে, এটি হলো উদ্দিষ্ট তাওহীদ ও চূড়ান্ত লক্ষ্য। আর এটিই হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ"? কারণ তারা সৃষ্টি করার ক্ষমতা দ্বারা উলূহিয়্যার তাফসীর করেছে।" [৮৮]

শায়খ মুহাম্মাদ আমীন শানকীতী রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ "পুরো আল-কুরআনুল আযীমের অনুসন্ধান বলে যে, আল্লাহর তাওহীদ তিনভাগে ভাগ হয়:

প্রথম: রুবুবিয়্যাহর ক্ষেত্রে আল্লাহর তাওহীদ। তাওহীদের এই প্রকারের ওপর বিবেকিদের জন্মগত স্বভাব তৈরি করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَهُمۡ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۖ فَأَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ ٨٧﴾ [الزخرف: 87]

"তুমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করো তোমাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে? তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্"। [আয-যুখরুফ:৮৭] এবং তিনি বলেন, বলুন,

﴿قُلۡ مَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أَمَّن يَمۡلِكُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَمَن يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُۚ فَقُلۡ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣١﴾ [يونس: 31]

‘কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে জীবনোপকরণ সরবারহ করেন অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার কর্তৃত্বাধীন, জীবিতকে মৃত থেকে কে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত হতে কে বের করেন এবং সব বিষয় কে নিয়ন্ত্রণ করেন?’ তখন তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ্’। সুতরাং বলুন, ‘তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?’ [ইউনুস : ৩১] তাওহীদের এই প্রকার আল্লাহর জন্যে ইবাদতকে খালিস করা ছাড়া কোনো উপকার করবে না।

দ্বিতীয়:ইবাদতে আল্লাহ তা‘আলার তাওহীদ। তাওহীদের এই প্রকারের নীতি হলো لا إله إلا الله এর অর্থকে বাস্তবায়ন করা। এই কালিমাহ নেতিবাচক ও ইতিবাচক দু’টি শব্দ দ্বারা গঠিত। নেতিবাচকের অর্থ হলো ইবাদত যে কোনো প্রকারেরই হোক তাতে আল্লাহ ছাড়া সকল প্রকার উপাস্যকে পরিত্যাগ করা।

ইতিবাচকের অর্থ হলো: সকল প্রকার ইবাদতকে ইখলাসসহ একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার সঙ্গে সেভাবেই খাস করা, তিনি যেভাবে তা সম্পাদন করতে বলেছেন তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানীতে। এটিই সেই বিষয় যেখানেই হলো রাসূল ও তাদের উম্মাতের মধ্যকার দ্বন্ধ।

﴿أَجَعَلَ ٱلۡأٓلِهَةَ إِلَٰهٗا وَٰحِدًاۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيۡءٌ عُجَابٞ ٥﴾ [ص: 5]

“সে কি বহু মাবুদকে এক মাবুদে পরিণত করে দিয়েছে? নিশ্চয়ই এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার!” [সোয়াদ: ৫] তাওহীদের এই প্রকার প্রমাণকারী আরও অনেক আয়াত থেকে একটি হচ্ছে আল্লাহর বাণী:

﴿فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ ...﴾ [محمد: 19]

“সুতরাং তুমি জেনে রেখ যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো [প্রকৃত] ইলাহ নেই। আর তুমি তোমার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) কর।” [মুহাম্মাদ: ১৯] আল-আয়াহ।

তৃতীয় প্রকার : আল্লাহ তা‘আলার নাম ও সিফাতসমূহে তাঁর তাওহীদ।” [৮৯]

যেসব আয়াত তাওহীদের এই তিন প্রকারকে একত্র করেছে তন্মধ্যে একটি হলো সূরা মারয়ামের আয়াত[৯০]। আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতালা বলেন:

﴿رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا فَٱعۡبُدۡهُ وَٱصۡطَبِرۡ لِعِبَٰدَتِهِۦۚ هَلۡ تَعۡلَمُ لَهُۥ سَمِيّٗا ٦٥﴾

[مريم: 65]

তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও তাদের অন্তর্বর্তী যা কিছু আছে, সে সবের রব। কাজেই একমাত্র তাঁর ইবাদাত করুন এবং তাঁর ইবাদাতে ধৈর্যশীল থাকুন। আপনি কি তাঁর সমনামগুণসম্পন্ন কাউকেও জানেন? [মারয়াম : ৬৫]

শায়খ আব্দুর রহমান ইবনু সা’দী আয়াতে বর্ণিত তাওহীদ স্পষ্ট করে বলেন, “...আয়াতটি মহা নীতিসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যেমন তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহকে, অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক জিনিসের রব, স্রষ্টা, রিযিকদাতা ও পরিচালনাকারী। আরো অন্তর্ভুক্ত করেছে তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ ও ইবাদাহকে, অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলাই হলেন সত্য ইলাহ ও মাবুদ। আরো অন্তর্ভুক্ত করেছে যে, তাঁর রুবুবিয়্যাহই তাঁর ইবাদাহ ও তাওহীদকে ওয়াজিবকারী। আরো অন্তর্ভুক্ত করেছে যে, আল্লাহ তা‘আলা পরিপূর্ণ নাম ও সিফাত এবং মহান প্রশংসা ও সম্মানের মালিক। এতে তাঁর কোনো সদৃশ, সমকক্ষ ও সমনামের

কেউ নেই। বরং তিনি সকল প্রকার ও সকল বিবেচনায় ব্যাপক পূর্ণতায় এক ও একক।” [৯১]

তাওহীদের এই তিন প্রকারের ওপর আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতে অনেক দলিল ও প্রমাণ রয়েছে।

১- তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহর দলিল হলো আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢﴾ [الفاتحة: 2]

সকল ‘হাম্‌দ’ আল্লাহর, যিনি সৃষ্টিকুলের রব, [আল-ফাতিহাহ: ২] এবং তার বাণী

﴿...أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٥٤﴾ [الأعراف: 54]

“জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই। আল্লাহই বরকত দানকারী, যিনি সকল সৃষ্টির রব।” [আল-আরাফ : ৫৪] এবং তার বাণী

﴿قُلۡ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ قُلِ ٱللَّهُۚ ...﴾ [الرعد: 16]

“বল, আসমানসমূহ ও জমিনের রব কে ? বলুন, আল্লাহ।” [আর-রা‘দ: ১৬] এবং তার বাণী বলুন, ‘যমীনে এবং

﴿قُل لِّمَنِ ٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٨٤ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٨٥ قُلۡ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبۡعِ وَرَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ ٨٦ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٨٧ قُلۡ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيۡهِ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٨٨ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ فَأَنَّىٰ تُسۡحَرُونَ ٨٩﴾ [المؤمنون: 84-89]

এতে যা কিছু আছে এগুলো(র মালিকানা) কার? যদি তোমরা জান (তবে বল)।' (৮৪) অবশ্যই তারা বলবে, 'আল্লাহর।' বলুন, 'তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? বলুন, 'সাত আসমান ও মহা-'আরশের রব কে?' (৮৬) অবশ্যই তারা বলবে, 'আল্লাহ্।' বলুন, 'তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?' (৮৭) বলুন, 'কার হাতে সমস্ত বস্তুর কর্তৃত্ব? যিনি আশ্রয় প্রদান করেন অথচ তাঁর বিপক্ষে কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না, যদি তোমরা জান (তবে বল)।' (৮৮) তারা বলবে, আল্লাহ। বলুন, তবুও কীভাবে তোমরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছ? (৮৯) [আল-মু'মিনূন : ৮৪-৮৯] **এবং তার বাণী**

﴿... ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْۖ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ٦٤﴾ [غافر: 64]

"তিনিই হলেন তোমাদের রব, জগতসমূহের রব বরকতময়।" [গাফির: ৬৪] **এবং তার বাণী আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং**

﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍۖ ...﴾ [الزمر: 62]

তিনি সমস্ত কিছুর তত্ত্বাবধায়ক। [আয-যুমার: ৬২] **এ ছাড়া আরো আয়াত রয়েছে। ২- তাওহীদুল উলূহিয়্যার আরো দলিল, আল্লাহ তা'আলার বাণী:**

﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ٢﴾ [الفاتحة: 2]

আল্লাহর জন্যেই সকল সশ্রদ্ধ প্রশংসা [আল-ফাতিহাহ: ২] **কেননা আল্লাহ শব্দের অর্থ হলো উপাস্য মাবুদ। এবং আল্লাহর আরও বাণী:**

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٥﴾ [الفاتحة: 5]

আমরা শুধু আপনারই 'ইবাদাত করি, এবং শুধু আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি, [আল-ফাতিহাহ: ৫] **এবং**

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ٢١﴾ [البقرة: 21]

তার বাণী হে মানুষ! তোমরা তোমাদের একমাত্র সেই রব এর ‘ইবাদাত করো যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অধিকারী হও। [আল-বাকারাহ ২১] **এবং তার বাণী**

﴿... فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ ٢ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلۡخَالِصُۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ ...﴾ [الزمر: 2-3]

“অতএব তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁরই আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে।” (২) জেনে রেখ, আল্লাহর জন্যেই বিশুদ্ধ আনুগত্য-ইবাদাত। আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, ‘আমরা কেবল এ জন্যই তাদের ইবাদাত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।’ [আয-যুমার: ২-৩] **এবং তার বাণী বলুন,**

﴿قُلِ ٱللَّهَ أَعۡبُدُ مُخۡلِصٗا لَّهُۥ دِينِي ١٤ فَٱعۡبُدُواْ مَا شِئۡتُم مِّن دُونِهِۦۗ ...﴾ [الزمر: 14-15]

'আমি ইবাদাত করি আল্লাহরই তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রেখে’। (১৪) অতএব তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য যা কিছুর ইচ্ছা তোমরা ইবাদাত কর।’ [আয-যুমার: **১৪-১৫] এবং তার বাণী**

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥﴾ [البينة: 5]

আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই প্রদান করা হয়েছিল যে, তারা যেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে

এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে। আর এটাই সঠিক দ্বীন। [আল-বায়্যিনাহ: ৫] **এ ছাড়া আরো আয়াত রয়েছে। ৩-তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের আরো দলিল, আল্লাহ তা‘আলার বাণী:**

﴿ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣ مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ٤﴾ [الفاتحة: 3-4]

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। (৩) বিচার দিনের মালিক। (৪) [আল-ফাতিহা: ৩-৪] **এবং**

﴿قُلِ ٱدۡعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدۡعُواْ ٱلرَّحۡمَٰنَۖ أَيّٗا مَّا تَدۡعُواْ فَلَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ ...﴾ [الإسراء: 110]

তার বাণী বল, ‘তোমরা (তোমাদের রবকে) ‘আল্লাহ’ নামে ডাক অথবা ‘রহমান’ নামে ডাক, যে নামেই তোমরা ডাক না কেন, তাঁর জন্যই তো রয়েছে সুন্দর নামসমূহ।’ [আল-ইসরা: ১১০] **এবং তার বাণী**

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ لَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ ٨﴾ [طه: 8]

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই; সুন্দর নামসমূহ তাঁরই। [ত্বহা: ৮] **এবং তার বাণী**

﴿... لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾ [الشورى: 11]

“তাঁর মতো কিছু নেই, আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।” [আশ-শূরা : ১১] **এবং সূরা হাশরের শেষাংশ ও অন্যান্য আয়াত।**

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত।

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলোঃ কিতাব ও সুন্নাহে বর্ণিত আল্লাহর নাম ও সিফাতসমূহে সুদৃঢ় ঈমান পোষণ করা,

কোনো বিকৃতি বা বাতিল করা বা ধরন বর্ণনা করা বা সদৃশ বর্ণনা করা ছাড়া তা (আল্লাহর জন্যে) সাব্যস্ত করা।

“এ অধ্যায়ে মূল নীতি হলো আল্লাহ সেসব গুণ দ্বারা নিজেকে গুণান্বিত করেছেন অনুরূপভাবে তার রাসূল তাকে যেসব গুণ দ্বারা গুণান্বিত করেছেন সেগুলো না-বাচক হোক বা হা-বাচক হোক আল্লাহর জন্যে সাব্যস্ত করা। অতএব আল্লাহ যা নিজের জন্যে সাব্যস্ত করেছেন তা তার জন্যে সাব্যস্ত করবে আবার আল্লাহ যা নিজের জন্যে নাকচ করেছেন তা তার জন্যে নাকচ করবে। আর সালাফ ও তাদের ইমামদের নীতি থেকে জানা গেছে যে, তিনি যেসব সিফাত নিজের জন্যে সাব্যস্ত করেছেন সেগুলোকে ধরন বর্ণনা করা ছাড়া, উপমা বর্ণনা করা ছাড়া, বিকৃতি করা ছাড়া ও অর্থহীন করা ছাড়া আল্লাহর জন্যে সাব্যস্ত করা। অনুরূপভাবে তাঁরা আল্লাহ তা‘আলা যা নিজের জন্যে নাকচ করেছেন তা তাঁর জন্যে নাকচ করেন, তার সাথে তিনি যেসব সিফাত সাব্যস্ত করেছেন সেগুলোকে সাব্যস্ত করেন, তার নামসমূহে ও আয়াতসমূহে বিকৃতি করা ছাড়া। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা যারা তাঁর নাম ও আয়াতসমূহে বিকৃতি ঘটান তাদের বদনাম করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِيٓ أَسۡمَٰٓئِهِۦۚ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٨٠﴾ [الأعراف: 180]

আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায়। তারা যা করত অচিরেই তাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে। [আল আরাফ : ১৮০] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا لَا يَخۡفَوۡنَ عَلَيۡنَآۗ أَفَمَن يُلۡقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيۡرٌ أَم مَّن يَأۡتِيٓ ءَامِنٗا يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ ٱعۡمَلُواْ مَا شِئۡتُمۡ إِنَّهُۥ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٤٠﴾ [فصلت: 40]

নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহ বিকৃত করে বিমুখ হয় , তারা আমার অগোচরে নয়। যে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে সে কি শ্রেষ্ঠ, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে উপস্থিত হবে সে? তোমরা যা ইচ্ছে আমল কর। তোমরা যা আমল কর, নিশ্চয় তিনি তার সম্যক দ্রষ্টা। [ফুসসিলাত:৪০] **অতএব তাদের (সালাফদের) তরিকা মাখলুকের সঙ্গে সাদৃশ্য সাব্যস্ত করা ছাড়া নামসমূহ ও সিফাতসমূহ সাব্যস্ত করাকে শামিল করে। এমনভাবে সাব্যস্ত করা যাতে সাদৃশ্য নেই এবং এমনভাবে তাকে পবিত্র করা যাতে বাতিল করা নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,**

﴿... لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾ [الشورى: 11]

"তাঁর মতো কিছু নেই, আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" [আশ-শূরা : ১১] **তাঁর বাণী: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)-তে সাদৃশ্য ও উপমার প্রত্যাখ্যান রয়েছে। আর তাঁর বাণী: (وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)-তে বিকৃতি ও বাতিল করার প্রত্যাখ্যান রয়েছে।**

"আপনি যখন জানলেন যে, তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত হলো আল্লাহ তা'আলাকে সে নামে ডাকা যে নামে তিনি নিজেকে নামকরণ করেছেন এবং তাকে এমন বিশেষণে বিশেষিত করা যার দ্বারা তিনি নিজেকে অথবা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিশেষিত করেছেন। আর তাঁর থেকে সাদৃশ্যতা ও উপমাকে দূরীভূত করা। অতএব এর বিপরীত কয়েকটি বিষয় দাড়ালো: [৯৪]

প্রথম বিষয় হলো: তার কোনো নামকে অথবা তার নাম যেসব সিফাত ও আহকামের ওপর প্রমাণ বহন করে তার কোনোটিকে অস্বীকার করা, যেমনটি আহলুত তা'তীল করেছে।

দ্বিতীয় বিষয় হলো: আল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতালা নিজেকে যে নামে নামকরণ করেননি সে নামে তাকে নামকরণ করা। কেননা আল্লাহর নামসমূহ তাওকিফী (ওহী নির্ভর), কাজেই আল্লাহ নিজেকে যে নামে নামকরণ করেননি সে নামে তাকে নামকরণ করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নামের ভেতর যা ওয়াজিব হয় তার থেকে বিচ্যুত হওয়া।

তৃতীয় বিষয় হলো : এই বিশ্বাস করা যে, এসব নাম সৃষ্টি জীবের গুণের ওপর প্রমাণ বহনকারী, ফলে তা সাদৃশ্যের অর্থ প্রদানকারী বানিয়ে ফেলা।

চতুর্থ বিষয় হলো: আল্লাহর নামসমূহ থেকে মূর্তিদের নাম বের করা, যেমনটি মুশরিকরা করেছে, উজ্জা আযীয থেকে এবং লাত ইলাহ থেকে বের করে।

পঞ্চম বিষয় হলো: আল্লাহকে তাঁর পরিপূর্ণতার সিফাত ও বড়ত্বের বিশেষণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা, অথবা তাঁর সিফাতসমূহকে তার মাখলুকের সিফাতের সঙ্গে তুলনা করা। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿...لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾ [الشورى: 11]

"তাঁর মতো কিছু নেই, আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" [আশ-শূরা : ১১] তিনি আরো বলেন,

﴿يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلۡمٗا ١١٠﴾ [طه: 110]

তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে ,তা তিনি অবগত, কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা আল্লাহকে বেষ্টন করতে পারে না। [ত্বহা: ১১০] [৯৫]

প্রথমত: তাওহীদুল আসমাঃ

মাতুরীদিয়্যারা আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ সাব্যস্ত করা ওয়াজিব বলেন এবং তা সাব্যস্ত করা সাদৃশ্যকে আবশ্যক করে না বলেন। দলিল হলো রাসূলগণ ও কিতাবসমূহ এসব নাম নিয়েই এসছে, যদি তা সাব্যস্ত করার ভেতর সাদৃশ্য থাকে তাহলে তা রিসালাতের ভেতর একটি খুঁদ।

আবুল মানসুর মাতুরীদী বলেনঃ "আমাদের নিকট মূলনীতি হলো আল্লাহর কিছু স্বত্বাগত নাম রয়েছে যেগুলো দ্বারা তাকে নামকরণ করা হয়,যেমন তার বাণী :

﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ ١﴾ [الرحمن: 1]

[সূরা আর-রাহমান:১], অতঃপর আমরা যা বলেছি তার দলিল হলো রাসূলগণ ও আসমানী কিতাবসমূহের তা নিয়ে অবতীর্ণ হওয়া। রাসূলগণ যা নিয়ে এসছেন তাতে যদি সাদৃশ্য হত তাহলে তারা নিজেরাই তাওহীদ ভঙ্গের কারণ হতেন। তবে যেহেতু ওই সব নাম দ্বারা নামকরণকৃত পরিচিত বস্তুসমূহের বাইরে অন্যান্য সত্ত্বা (রূপকের ভিত্তিতে) উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভবপর, যার ফলে তাদের (নবীগণের) তা নিয়ে আগমন করা বৈধ হয়েছে, যদিও আল্লাহ বলেছেন,

﴿... لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ ...﴾ [الشورى: 11]

"তার মত কোনো জিনিস নেই।" যেন তার দ্বারা বস্তুসমূহের বস্তুত্ব নিষেধ করা যায়।" [৯৬]

মাতুরীদিয়্যাদের জমহুর আলেমগণ আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ ওহী নির্ভর মতটি গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ নামসমূহ সাব্যস্ত করার তরিকা হলো ওহী (বর্ণনা)। কাজেই আল্লাহ নিজের নফসকে যে নামে নামকরণ করেছেন এবং শরীয়ত যে নাম নিয়ে এসেছে তা ছাড়া অন্য নামে তাঁকে নামকরণ করা যাবে না।

মাতুরীদী আল্লাহ থেকে جسم (শরীর) নামটি অসাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে বলেনঃ "তার হক হলো আল্লাহ থেকে শ্রবণ করা যে, শরীর (জিসম) আল্লাহর নাম নয় (বা তার নাম), অথচ এমনটি না তার থেকে আর না এমন কারো থেকে বর্ণিত হয়েছে, যাকে অনুসরণ করার অনুমিত কাউকে প্রদান করা হয়েছে। অতএব এ কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়, আর যদি তা আন্দাজে বলা বৈধ হয় ইন্দ্রিগ্রাহ্য অথবা অহী অথবা বিবেকি দলিল ছাড়া, তাহলে দেহ (জাসাদ) ও ব্যক্তি (শাখস) বলা বৈধ হবে। অথচ তার সবই হলো খারাপ। এমন কথা নয় মাখলুককে যেসব নামে নামকরণ করা হয় তার সবগুলো দ্বারা তাকে নামকরণ করা বৈধ হবে। অথচ তা বাতিল।" [৯৭]

আর যে বিষয়টি তাদেরকে আল্লাহর নামসমূহ তাওকিফী (ওহী নির্ভর) বলতে বাধ্য করেছে তা হলো আল্লাহর ওপর এমন নামসূহ প্রয়োগ করার ভয় যা আল্লাহু সুবহানাহুকে এমন কিছু দ্বারা বিশেষিত হওয়ার ধারনা সৃষ্টি করে যাতে ত্রুটি রয়েছে। কাজেই সতর্কতামূলক তারা (আল্লাহর নামগুলোকে) ওহী নির্ভর বলেছেন। বায়ানুল ই'তিকাদ এর লেখক এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন তার বাণীতে: "হক হলো তাওকিফী (ওহী নির্ভর) বলা জরুরি। যেই বাতিল ধারনার সৃষ্টি হয় তার থেকে সতর্কতার জন্যে, যেহেতু তাতে বিচ্যুতি হওয়া অনেক বড় বিষয়! কাজেই আমাদের জ্ঞানের পরিধি মোতাবেক বাতিলের সন্দেহ সৃষ্টি না হওয়ার ওপর যথেষ্ট মনে করা বৈধ নয়, বরং শরীয়তের নির্দেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া জরুরি।" [৯৮]

আবূল মানসুর মাতুরীদী বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলার জন্যে "ইয়া মুবারাক" বলা জায়েয নয়। কেননা এটি আল্লাহর নাম ওহীর বর্ণনা দ্বারা জানা যায়নি। আর আমাদের দায়িত্ব হলো যা দ্বারা আল্লাহ নিজের নামকরণ করেননি তা দ্বারা তাঁর নামকরণ করা থেকে বিরত থাকা।"[৯৯]

অতঃপর মাতুরীদিয়্যারা নামসমূহ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদের অধ্যায় ও নামকরণের অধ্যায়ে পার্থক্য করেননি। ফলে তারা আল্লাহর নামসমূহে এমন নামও দাখিল করেছেন যা তার নাম নয়, যেমন صانع (সানি'), قديم (কাদীম), ذات (যাত), شيء (শাই) ও এ জাতীয় শব্দ।

তিনি আল্লাহর ওপর شيء শব্দটি প্রয়োগ করা জায়েয সাব্যস্ত করার বিষয়ে বলেন, তা আল্লাহর নামসমূহের একটি। দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿...لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ...﴾ [الشورى: 11]

"তাঁর মতো কোনো কিছু নেই"। [আশ-শুরা: ১১] আর আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿قُلۡ أَيُّ شَيۡءٍ أَكۡبَرُ شَهَٰدَةٗۖ قُلِ ٱللَّهُۖ شَهِيدُۢ بَيۡنِي وَبَيۡنَكُمۡۚ ...﴾ [الأنعام: 19]

"বল, 'সাক্ষ্য হিসেবে সবচেয়ে বড় বস্তু কী?' বল, আল্লাহ সাক্ষী আমার ও তোমাদের মধ্যে।" [আল-আনআম: ১৯] অতঃপর, এসবকে (আল্লাহর নাম) মেনে নেয়া ওয়াজিব, কারণ শ্রুত বর্ণনায় তার দ্বারা নামকরণ করা সাব্যস্ত হয়েছে।" [১০০]

আর (আল্লাহর) নামসমূহের অর্থ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে তাদের বিষয়টি হলো, তারা নামের অর্থ হয় 'যাত' (সত্বা) করেন। আর এটি শুধু (আল্লাহ) নামের ক্ষেত্রেই; অথবা তাদের নিকট অর্থটি গৃহীত হবে

তারা যেসব সিফাত সাব্যস্ত করেছে তার ভিত্তিতে, যেমন السميع (আস-সামী) البصير (আল-বাসীর) العليم (আল-আলীম)। অথবা সেগুলোকে নেতিবাচক ও সম্বন্ধ বাচক সিফাতের দিকে ফিরাবে।

অতএব তাদের নিকট নামটি যদি তারা যেসব সিফাত সাব্যস্ত করেছে তার ওপর প্রমাণ বহন করে, তাহলে সেটিকে তারা তার হাকিকতের ওপর সাব্যস্ত করে, আর যদি (তাদের সাব্যস্ত করা সিফাতের) বিরোধী হয় তাহলে সেটিকে তার হাকিকত থেকে ব্যাখ্যা দ্বারা ফিরিয়ে নেয়। কারণ, তাদের বিশ্বাস হলো, নামটি যে অর্থ ও হাকিকত বুঝায় তা বিবেকিয় (অকাট্য) দলিল বিরোধী।

ইবনুল হুমাম বলেন, "অতঃপর আল্লাহ তা'আলা শ্রবণ করার কারণে سميع (শ্রোতা),তিনি শ্রবণ সিফাতের কারণেبصير (দ্রষ্টা), ইলমের কারণে عليم (সবজান্তা), ক্ষমতার কারণেقدير (ক্ষমতাধর) এবং তার ইচ্ছার কারণে তিনি مريد(ইচ্ছাকারী)।কেননা আল্লাহ তাআলা আরবী ভাষীদেরকে সম্বোধন করার সময় নিজের নফসের ওপর এসব নাম প্রয়োগ করেছেন।আর অভিধানে 'আলীম' দ্বারা এমন সত্ত্বাকে বুঝায় যার ইলম রয়েছে, বরং তাদের নিকট ইলম ছাড়া আলীম হওয়া অসম্ভব যেমন জ্ঞানের বিষয় ছাড়া জ্ঞান অসম্ভব।কাজেই বিবেকী অকাট্য দলিল ছাড়া আল্লাহর নামগুলোকে তার হাকিকি অর্থ থেকে ফিরানো জায়েয হবে না যা তা নাকচ করাকে ওয়াজিব করে।"[১০১]

আর বায়াধি বলেন, "নিশ্চয় নামের অর্থ কখনো হুবহু যাত ও হাকিকত হয়। এরূপ শুধুই 'আল্লাহ' নামটি। আর কখনো (নামের অর্থ) হয় সিফাত, কর্ম, হ্রাস করা ও বৃদ্ধি করার হিসেবে। আর এ হিসেবে আল্লাহ তা'আলার নাম অনেক হওয়ার ব্যাপারে কোনো অস্পষ্টতা নেই।" [১০২]

আর (আল্লাহ ছাড়া) অন্যান্য নামের ক্ষেত্রে মাতুরিদিরা স্বীকার করেন যে, সিফাতের হিসেবে গৃহীত তার অনেক অর্থ (সিফাত)

রয়েছে, অর্থাৎ সেগুলো যেমন সত্বাকে বুঝায় তেমন সিফাতকে বুঝায়। তবে যেসব নামের অর্থ সিফাতের অধ্যায়ে তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে মিলে না সেগুলোকে সঠিকভাবে তাদের অর্থ ও হাকিকতের ওপর সাব্যস্ত করে না, বরং সিফাতের অধ্যায়ে তাদের বিশ্বাস মোতাবেক সেগুলোতে ব্যাখ্যা করে।

তার উদাহরণ হলো, আল্লাহর নাম (الأعلى) (আল-'আলা)। মাতুরীদী (الأعلى) নামের ব্যাখ্যায় বলেনঃ (الأعلى) অর্থাৎ তাকে প্রয়োজন স্পর্শ করবে অথবা তাকে বিপদ আক্রান্ত করবে তা থেকে তিনি সুউচ্ছে আছেন। [১০৩]

আবূল বারাকাত আন-নাসাফী বলেনঃ "الأعلى (সর্বোচ্চ) অর্থ হলো বশ ও অধীন করার ক্ষমতা। স্থানের বিবেচনায় উচ্চ হওয়ার অর্থ নয়।" [১০৪]

সারকথা হচ্ছে,আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের ব্যাপারে তাদের মযহাব দু'প্রকার:

প্রথম প্রকার: যা হকের অন্তর্ভুক্ত এবং বাহ্যিকভাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মোতাবেক হয়েছে। এরূপ বিষয়গুলো হলো:

১- আল্লাহ তা'আলার জন্যে সকল নাম ও সিফাত সাব্যস্ত করা। আর এর দ্বারাই তারা কট্টর জাহমিয়াদের থেকে পৃথক হয়েছে, যারা আল্লাহর জন্যে নামসমূহ সাব্যস্ত করে না। [১০৫]

২- আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের অনেক অর্থকে সাব্যস্ত করা। আর এর দ্বারা তারা মুতাযিলার জাহমিয়্যাহ থেকে পৃথক হয়েছে। কেননা তারা নামসমূহকে অর্থ ছাড়া সাব্যস্ত করে। [১০৬]

৩- আল্লাহ তা‘আলার নামসমূহ তাওকিফী (ওহী নির্ভর), ফলে আল্লাহ তা‘আলাকে শরীয়তে বর্ণিত নাম ছাড়া নামকরণ করা যাবে না।[১০৭]

৪- আল্লাহ তা‘আলার সকল নাম সুন্দর (হুসনা)। আর তার নামগুলো অর্থ ছাড়া কেবলই শব্দ নয়, বরং তা মর্যাদা, পবিত্রতা ও মহত্বের ন্যায় অনেক সুন্দর অর্থকে বহন করে। [১০৮]

অতএব আল্লাহ তা‘আলার নামগুলো সবচেয়ে সুন্দর ও মহান নাম। কেননা তা সবচেয়ে সুন্দর ও সর্বোত্তম অর্থের সংবাদ প্রদান করে। অধিকন্তু তা বড়ত্ব, সৌন্দর্য ও সম্মানীতের ন্যায় পরিপূর্ণ সিফাতের ওপর প্রমাণ বহন করে। [১০৯]

দ্বিতীয় প্রকার: যা বাতিল ও ইলহাদ (বিকৃতি)-কে অন্তর্ভুক্ত করেছে:

তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলো নিম্নরূপ:

১- আল্লাহর নামগুলো প্রকৃতভাবে (অর্থ ও শব্দগতভাবে) আল্লাহর নাম নয়। আবূ মানসূর মাতুরীদী বলেনঃ “অতএব আপনাকে বলবে যে, যেসব নাম দ্বারা আমরা তাঁকে (আল্লাহকে) নামকরণ করি সেগুলো এমন নাম যা (তাঁকে) বিবেক ও বুঝের নিকটবর্তী করে দেয়, প্রকৃতভাবে তা তার নাম নয়।” [১১০]

২- আল্লাহর সুন্দর নামগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ সিফাত-কে অন্তর্ভুক্তকারী নয়, বরং তা তাকওয়ীন (ক্রিয়া সম্পাদনকারী) সিফাতের অন্তর্ভুক্ত। আনওয়ার শাহ কাশমীরী দেওবন্দী বলেনঃ “আশআরীদের নিকট “আল্লাহর সুন্দর নামগুলো” হলো الإضافات (ইধাফাত), অর্থাৎ তার সত্বার সঙ্গে জড়িত সিফাত নয়, বরং তার সত্বা থেকে পৃথক ও তার সঙ্গে সম্বন্ধীয় সিফাত আর মাতুরীদের নিকট এগুলো তাকওয়ীন(ক্রিয়া সম্পাদনকারী) সিফাতের অন্তর্ভুক্ত।” [১১১]

৩- মাতুরীদীদের নিকট আল্লাহর সুন্দর নামগুলো সৃষ্ট (মাখলুক): কেননা এগুলো শব্দ ও অক্ষরের নাম। আর তা মাখলুক। এ জন্যেই তারা আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নামসমূহের কেবল নামই সাব্যস্ত করেছে।

যখন তারা বলল, এগুলো (সুন্দর নামসমূহ) কেবল নামই। তখন আরো বলল, এগুলো আল্লাহ ছাড়া ভিন্ন , কেবল অক্ষর ও শব্দ। আর আদি নাম হল হুবহু সত্বা। আর তা হলো আল্লাহ অন্য নাম নয়। [১১২] এসব হলো তাদের মাযহাব "আল্লাহর নামসমূহ সৃষ্ট" পর্যন্ত পৌঁছার জন্যে একেকটি ধাপ, যা তাদের কথাঃসেগুলো আল্লাহ ছাড়া ভিন্ন'। কারণ,যা কিছু আল্লাহ ছাড়া ভিন্ন তার সবই মাখলুক। [১১৩]

মাতুরিদের নিকট নামসমূহের অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার একটি হলো: ইসম ও মুসাম্মা (নাম ও নামের ধারক সত্ত্বা)। এই মাসআলায় মাতুরীদিয়্যারা গ্রহণ করেছে যে, ইসমই হলো মুসাম্মা (অর্থাৎ নাম ও নামের ধারক সত্ত্বা এক)। আর তারা আল্লাহ তা'আলার (নিম্নের) বাণীকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছে: "তোমার রবের নাম বরকতময়।" [আর-রাহমান: ৭৮] এবং তার বাণী আপনি আপনার সুমহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন, [আল-'আলা: ১]

তারা আরো বলেছে,নিশ্চয় আল্লাহ হলেন সৃষ্টিকর্তা আর তিনি ছাড়া যা আছে তা সবই মাখলুক।কাজেই যদি তার নামসমূহ আল্লাহ ছাড়া ভিন্ন হয় তাহলে সেগুলো অবশ্যই মাখলুক হবে।কাজেই আদিতে তার কোনো নাম ও সিফাত না থাকা জরুরি হল।[১১৪]

বাযদাওয়ী বলেন, "দলিল আমাদেরকে এবং প্রত্যেক জ্ঞানীকে বাধ্য করে যে, নামই হলো হুবহু সত্তা। কেননা মানুষ আদিষ্ট হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে, তার বড়ত্ব ঘোষণা করবে, তার তাকবীর ও তাহলীল পাঠ করবে। যদি নাম সত্তা ছাড়া অন্য কিছু

হয় তাহলে তা ভুল সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাঁর সাথে কোনো বস্তুকে শরীক করো না।" [আন-নিসা : ৩৬] এবং তিনি বলেন, "হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করো"। [আল-হাজ্জ: ১], [১১৫]

আবূল মুয়ীন আন-নাসাফী বলেন, "তুমি জেনে রাখ যে, ইসম ও মুসাম্মা (নাম ও নামের ধারক সত্তা) এক। আর আল্লাহ তা'আলা তার সকল নামসমূহে এক। আমাদের দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী: "অতএব আল্লাহর ইবাদত কর একমাত্র তাঁর জন্যে দীনকে খালিস করে।" [আয-যুমার:২] আর আল্লাহ তা'আলার বাণী: "অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যেই আদিষ্ট হয়েছে।" [আত-তাওবাহ: ৩১] আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা তাঁর তাওহীদকে আঁকড়ে ধরব, যদি আল্লাহর ইসম (নাম) আল্লাহ ছাড়া ভিন্ন কিছু হতো, তাহলে নামের জন্যে তাওহীদ হবে, আল্লাহর জন্যে তাওহীদ হাসিল হবে না।" [১১৬]

এই মাসআলায় যা সঠিক তা ব্যাখ্যামূলকঃ "নাম (শব্দ বিশেষ্য) দ্বারা কখনো মুসাম্মা (ব্যক্তি বিশেষ্য) উদ্দেশ্য হয়। কখনো তার দ্বারা শব্দ-বিশেষ্য উদ্দেশ্য হয় যা ব্যক্তি-বিশেষ্য-কে বুঝায়। যখন তুমি বললে, আল্লাহ এরূপ বলেছেন, আল্লাহ তাঁর আরশের উপরে হয়েছেন, আল্লাহ শুনেছেন,দেখেছেন ও সৃষ্টি করেছেন, তখন তার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে নির্ধারিত সরাসরি সত্তা। আর যখন বলবে, (الله) একটি আরবী নাম, (الرحمن) আরেকটি আরবী নাম। আর (الرحمن) আল্লাহর নামসমূহ থেকে একটি নাম। (الرحمن) এর ওজন হলো فعلان আবার (الرحمن) শব্দটি الرحمة থেকে উদগত প্রভৃতি। এখানে ইসমটি হলো মুসাম্মা (বিশেষ্য), গায়রে মুসাম্মা (বিশেষ্য ছাড়া অন্য কিছু) বলা হবে না। কেননা গায়র শব্দে অস্পষ্টতা রয়েছে। আর যদি গায়ের দ্বারা বুঝানো হয় যে, শব্দটি অর্থের গায়ের তাহলে ঠিক আছে। আর যদি

বুঝানো হয় যে, আল্লাহ ছিলেন কিন্তু তার কোনো নাম ছিল না যতক্ষণ না তিনি নিজের জন্যে নাম তৈরি করেছেন অথবা যতক্ষণ না তার মাখলুক নিজ থেকে বানিয়ে তাকে নামকরণ করেছে, তাহলে এটিই হবে সবচেয়ে বড় ভ্রষ্টতা ও নাস্তিকতা।” [১১৭]

দ্বিতীয়ত: তাওহীদুস সিফাত।

মাতুরীদিয়্যারা আল্লাহ তা‘আলার সিফাত অধ্যায়ে কিছু সিফাতকে সিফাত হিসেবে গণ্য করেন। কারণ, তারা কতক সিফাত সাব্যস্ত করেন এবং এসব সিফাতের জন্যে আল্লাহর সত্তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হাকিকি অর্থ সাব্যস্ত করেন। এগুলো তাদের নিকট কেবল গুণবর্ণনাকারীর নর্ণনা নয় অথবা তার বিপরীত (অর্থ)-কে অস্বীকার করা নয়। [১১৮]

মাতুরিদিরা নিশ্চত করেছেন যে, এসব সিফাত সাব্যস্ত করলে সাদৃশ্যতা আবশ্যক করে না, কেননা স্রষ্টা ও সৃষ্টির হাকিকতের মাঝে কোনো সাদৃশ্যতা নেই। যদি সিফাত সাব্যস্ত করলে সাদৃশ্যতা আবশ্যক হয়, তাহলে মাখলুকের স্থায়ী হওয়া অথবা স্রষ্টার ক্ষণস্থায়ী হওয়া আবশ্যক হবে। আর এটি কোনো বিবেকবান বলেন না।

মাতুরীদী বলেনঃ “নামসমূহ প্রমাণ করা ও সিফাত সাব্যস্তকরণে কোনো সাদৃশ্যতা নেই, কারণ মাখলুকের হাকিকতসমূহ স্রষ্টার ভেতর নেই। যদি তার কোনোটিতে সাদৃশ্য হত, তাহলে তা তার থেকে স্থায়ী হওয়া অথবা তার ছাড়া অন্যের থেকে অস্থায়ী হওয়া বাতিল হয়ে যেত। যদি কোনো দিক থেকে তাকে অন্যের সঙ্গে সাদৃশ্য করা হয়, তাহলে সেই দিক থেকে তিনি একজন মাখলুকের মত হয়ে যাবেন।” [১১৯]

মাতুরীদিয়্যাদের নিকট ইতিবাচক সাব্যস্ত সিফাত আটটি: কুদরত, ইলম, হায়াত, ইচ্ছা (ইরাদাহ), শ্রবণ করা (সামউ), দেখা (বাসার), কথা বলা (কালাম) ও সৃষ্টি করা (তাকওয়ীন)। [১২০]

অন্যান্য সিফাত ব্যতীত তারা কেবল এসব সিফাতকে সাব্যস্ত করেন, কেননা তাদের নিকট বিবেক কেবল তার ওপরই প্রমাণ বহন করে। তাদের নিকট বিবেকের পক্ষ থেকে অন্যান্য সিফাতের ওপর কোনো প্রমাণ নেই। এ জন্যই তারা তা অস্বীকার করেন।

তারা এসব সিফাত প্রমাণ করতে দু'টি পদ্ধতি অবলম্বন করেন।কখনো তা ছাড়া তার অন্যান্য পদ্ধতিও গ্রহণ করেন।

প্রথম: (আল্লাহকে) ত্রুটিসমূহ থেকে পবিত্র করা।

দ্বিতীয়: ধ্বংসশীল বস্তুর প্রমাণ।

আবূল মুয়ীন আন-নাসাফী প্রথম পদ্ধতিটি স্পষ্ট করে বলেন, "যখন প্রমাণিত হল যে, জগতের স্রষ্টা আদি-স্থায়ী আর আদি স্থায়ী হওয়ার শর্ত হলো ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া,ফলে প্রমাণিত হল যে, তিনি চিরঞ্জীব, ক্ষমতাধর, শ্রবণকারী, দ্রষ্টা ও আলিম (জ্ঞানী), কেননা তিনি এরূপ না হলে (তার বিপরীত দোষসমূহ যেমন) মৃত্যু, অজ্ঞতা, অক্ষমতা, অন্ধত্ব ও বধিরতা দ্বারা বিশেষিত হবেন। কারণ, এ সিফাতগুলো ওই সিফাতগুলোর পশ্চাৎগামী। কাজেই যদি আল্লাহর জন্যে এগুলো সাব্যস্ত না হয় তাহলে তার বিপরীত সিফাতগুলো সাব্যস্ত হবে। আর সেগুলো হলো ত্রুটির সিফাত, অথচ আদি হওয়ার শর্ত হলো পরিপূর্ণ হওয়া। অতএব প্রমাণিত হল যে, আমরা যা বর্ণনা করলাম তিনি তার দ্বারা বিশেষিত, কারণ তার বিপরীত থেকে তিনি মুক্ত, যেগুলো ক্ষণস্থায়ী/ধ্বংসশীল হওয়ার আলামত। কেননা তা সবই ত্রুটি। [১২১]

দ্বিতীয় পদ্ধতির ব্যাপারে বলেন, "যখন আরো প্রমাণিত হল যে, এই বৈচিত্রময় জগতের স্রষ্টা তিনি। তিনিই তাকে তার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের ওপর সৃষ্টি করেছেন, যেমন সুগঠন, সুকঠিন, অভিনব বৈশিষ্ট্য, নিখুঁত গাঁথুনি ও সুবিন্যস্ত হওয়া, আসমানসমূহের স্তর বিন্যাস ও তাতে চলমান তারকারাজি এবং জীব-জন্তুর শরীরে যেসব আশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করা যায়, যেমন জীবন, ভালো-মন্দের পার্থক্য, উপকারী বস্তুকে গ্রহণ করা ও ক্ষতিকর ব্যস্তু থেকে দূরে থাকার শিক্ষা এবং তাদের ভেতরে থাকা ইন্দ্রীয় এবং জড় বস্তুর শরীরে থাকা অপরূপ বিষয় ও বৈশিষ্ট্যাবলীতে যদি কোনো নিখুঁত চিন্তা, সূক্ষ্ণ হৃদয়, বিচক্ষণ বিবেক,পূর্ণ স্মৃতি শক্তিসম্পন্ন ও যাচাই করার শক্তি ধারী পুরো জীবন চিন্তা করে, তবু তার হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হবে না। বরং, যে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম পরিকল্পনা তার হাজার ভাগের একভাগে রয়েছে তাতেও না। কাজেই প্রমাণিত হলো যে, তিনি জীবিত, সক্ষম, জ্ঞানী, শ্রবণকারী ও সর্বদ্রষ্টা। তার সম্পর্কে এই জ্ঞান প্রাথমিক পর্যায়ের সুস্পষ্ট বিষয়ের মতই হাসিল হয়। এমন কি সকল বিবেকী হয়তো ওই ব্যক্তিকে আহমক ও বোকা বলবে অথবা জেদ ও গোঁয়ার্তুমির সঙ্গে সম্পৃক্ত করবে, যে নকশাওয়ালা রেশমের গাঁথুনি, সুন্দর আকৃতি পাওয়া, উঁচু প্রাসাদ তৈরি করা ও চলমান নৌযান গ্রহণ করাকে (জীবিত ও সক্ষমের সঙ্গে সম্পৃক না করে) মৃত, অক্ষম সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করবে।

যেমন তারা যেসব সিফাত সাব্যস্ত করেনি সেগুলোর ক্ষেত্রে হয় তাফওয়ীধ (আল্লাহতে সোপর্দ করা) অথবা তাওয়ীল (ব্যাখ্যা করা) -এর পথ অনুসরণ করেছেন। আর বলেছেন, আমরা যদি এসব নসকে (আল্লাহর সিফাত সম্বলিত আয়াত ও হাদীসকে) তাফওয়ীধ ও তাওয়ীল ব্যতিরেকে হাকিকিভাবে যার অর্থ প্রদান করে তার ওপরই রেখে দেই এবং তার রূপক অর্থে রূপান্তর না করি, তাহলে অবশ্যই (অন্যের সঙ্গে আল্লাহর) সাদৃশ্য আবশ্যক হয়। আর এটি (আল্লাহর ত্রুটি

থেকে) পবিত্র হওয়ার বিপরীত। কেননা এসব দলীলের বাহ্যিক যা প্রমাণ করে বিবেক তা অসম্ভব মনে করে। আর তা হলো দলীলের ধারনাগত বাহ্যিক (অর্থ) বিবেকি নিশ্চিত দলিলের বিপরীত হওয়া, কাজেই আমরা তার ওপর বিবেকি দলিলকে প্রাধান্য দিব।

আর আমরা এসব (নসের) ধারনাগত বাহ্যিক এর বিষয়ে হয়তো তার অর্থ আল্লাহতে সোপর্দ করব যেমন —তাদের ধারনায়— পূর্বসূরীগণ করেছেন[১২৩] অথবা আমরা তাকে বিভিন্ন প্রকার রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করব, যা বিবেকি অকাট্য দলিলের সমর্থক হয়[১২৪]।

তারা ধারনা করে যে, এসব দলীলকে তার বাহ্যিক অর্থে বহন করা বিবেক অসম্ভব মনে করে। অতএব তার অর্থে হয় তাফওয়ীধ অবলম্বন করা হবে অথবা তা ব্যাখ্যা করা হবে। তারা প্রথমত: সাদৃশ্যে পতিত হয়েছে, দ্বিতীয়ত: সাদৃশ্য থেকে পলায়ন করেছে, তৃতীয়ত: নসগুলোকে বিকৃত করেছে, চতুর্থত: সিফাতগুলোকে বাতিল করেছে, পঞ্চমত: তারা যে সাদৃশ্য ও উপমা থেকে পলায়ন করেছে তাতেই পতিত হয়েছে, বরং তার চেয়ে কঠিন সমস্যায় পতিত হয়েছে, যেমন তারা আল্লাহকে অস্তিত্বহীন সিফাত দ্বারা বরং অসম্ভব দ্বারা বিশেষিত করেছে [১২৫]।

ষষ্টত: তারা বৈপরীত্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় পতিত হয়েছে, যেমন তারা এই সাদৃশ্যের কারণে কতক সিফাতকে সাব্যস্ত করেছে আর কতক সিফাতকে বাতিল করেছে, অথচ তারা যেসব সিফাত সাব্যস্ত করেছে তাতেও এসব সাদৃশ্য বিদ্যমান। কেননা তারা যা সাব্যস্ত করেছে আর যা সাব্যস্ত করেনি তার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই[১২৬]।

অতএব আল্লাহ তা'আলার সিফাতের ক্ষেত্রে মাতুরীদিয়্যাদের মাযহাবের সারাংশ হলো নিম্নরূপ:

১- তারা আল্লাহ তা‘আলার কতক ইতিবাচক স্বত্বাগত সিফাতকে সাব্যস্ত করেছে, যেমন তার হায়াত, ইলম, কুদরত ও ইরাদাহ।

২- যেমন তাদের অধিকাংশ আলিম আল্লাহ তা‘আলার শোনা ও দেখাকে সাব্যস্ত করেছেন[১২৭]।

৩- তারা নেতিবাচক সিফাতকে বিকৃতি ও বাতিল করাসহ সাব্যস্ত করেছে ,আর তার উভয় খারাপীতে পতিত হয়েছে।

৪- তারা তাকওয়ীনের সিফাতকে এই বিবেচনায় সাব্যস্ত করেছে যে, তা হলো ক্রিয়াগত সকল সিফাতের মূল। তাকওয়ীনের সিফাত দ্বারা উদ্দেশ্য কর্মের সিফাত, অর্থাৎ যেসব সিফাত তাকওয়ীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, যেমন সৃষ্টি করা, রিযক দান করা, জীবিত করা ও মৃত্যু দান করা।

অতএব তাকওয়ীন সিফাত হলো, আল্লাহু সুবহানাহু বস্তুসমূহকে অস্তিত্ব দান করেন, তিনি তার বাণী “কুন” দ্বার সৃষ্টি করেন, আকৃতি দেন, সুস্থ্য করেন এবং জীবন ও মৃত্যু দেন। এটিকে সিফাতুল খালক(সৃষ্টিগত গুণ) অথবা ক্রিয়াগত গুণ বলা হয় [১২৮],তাদের নিকট ফি‘ল হলো মাফউল থেকে ভিন্ন আর তাকওয়ীন হলো মুকাওয়ান থেকে ভিন্ন। এ কারণে তারা বলেন, আল্লাহর ক্রিয়াগত সিফাতসমূহ আদি, যেমন সৃষ্টি করা, জীবিত করা,রিযক দান করা প্রভৃতি, যদিও এসব থেকে সৃষ্ট বস্তুগুলো ক্ষণস্থায়ী [১২৯]।

৫- তারা যেসব সিফাত সাব্যস্ত করেছে সেগুলো সাব্যস্ত করার জন্যে কিতাব ও সুন্নাহর নস দ্বারা দলিল পেশ করেছে[১৩০]।

৬- তাদের কর্তৃক আল্লাহ তা‘আলার সিফাতসমূহকে সীমাবদ্ধ করা। যেমন তারা সকল সিফাতকে একুশটি সিফাতের ভেতর সীমাবদ্ধ করেছে তার বেশী নয়। আর তাদের কেউ কেউ ইতিবাচক সত্ত্বাগত সিফাতকে সাতটিতে সীমাবদ্ধ করেছেন আর অষ্টম সিফাত

হলো তাকওয়ীন। আর তা হলো ক্রিয়াগত সিফাত। তারা বলেন, "পরবর্তী অধিকাংশ আলেমের নিকট আটটি সিফাতের ওপর বর্ধিত হয় না আর অন্যান্য সিফাত তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে।" [১৩১]

যেমন দেওবন্দীদের একজন বড় ইমাম শাহ মুহাম্মাদ আনওয়ার কাশমিরী (১৩৫২হি.) স্পষ্ট করেছেন যে,সকল আসমাউল হুসনা তাকওয়ীন সিফাতের অন্তর্ভুক্ত[১৩২]।

আর জানা কথা যে, তাদের নিকট তাকওয়ীনের সিফাত কর্মগত সিফাতসমূহের কেন্দ্রস্থল। অথচ স্বয়ং সেটিই কর্মগত সিফাত। অতএব তারা মহান 'আল্লাহ' শব্দ ও তার মত আসমাউল হুসনা যা কিনা আল্লাহ তা'আলার স্বত্বা এবং পরিপূর্ণ ইতিবাচক স্বত্বাগত সিফাতকে বুঝায় তা কোথায় রাখবে, তাও কি তাকওয়ীন সিফাতের ভেতরেই রাখবে?

তারা যখন ইলাহী সিফাতকে তাদের উল্লিখিত সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করেছে, তখন তা ছাড়া আল্লাহর সকল পরিপূর্ণ সিফাতকে বাতিল করেছে এবং তার স্পষ্ট সুনির্দিষ্ট সহীহ নসগুলোকে বিকৃত করেছে।

তারা এসব সিফাতকে সাব্যস্ত করা সত্ত্বেও তা অসাব্যস্ত ও বাতিল করার দার প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে। কেননা তারা স্পষ্ট করেছে যে, এসব সিফাত মৌলিকভাবে একটি আদি সিফাত, তাতে আধিক্য ও নতুনত্ব নেই, নতুনত্ব হলো তার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে। কারণ, তাওহীদের পূর্ণতার সঙ্গে তাই উপযুক্ত হয়[১৩৩]।

কাজেই তারা শরীয়ত, বিবেক ও স্বভাবগতভাবে জানা সিফাতগুলোকে খারিজ করে দিয়েছে।

৭- তারা "কলাম'(কথার) এর সিফাতকে বাতিল করে দিয়েছে। আর তা হলো হরফ ও শব্দসহ আল্লাহ তা'আলার শ্রুত কথা। তিনি আগে কথক ছিলেন এবং সর্বদা কথক থাকবেন।

৮- তারা 'কালামে নাফসী'-এর ন্যায় বিদআতী কথা বলেন। তাদের কতক স্পষ্ট বলেছে যে, কুরআন মাখলুক বলার ক্ষেত্রে তাদের মাঝে ও মুতাযিলাদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই[১৩৪]।

৯- তারা সিফাতে ফি'লিয়্যাহ (কর্মগত গুণ)-কে সাব্যস্ত করে না আর সেটি আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত তাও বলে না, অথচ জানা কথা যে, সিফাত মাওসুফের (বিশেষণ বিশেষ্যের) সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত না হলে আর মাওসুফ সিফাত দ্বারা বিশেষিত না হলে সিফাত সিফাতই হয় না।

যেমন তারা বলেঃ "আর জানা বিষয় যে, তার প্রত্যেকটি—অর্থাৎ তারা যেসব সিফাত সাব্যস্ত করেছে—ওয়াজিব (অর্থাৎ আল্লাহর সত্ত্বা) দ্বারা যা বুঝা যায় তার চেয়ে বেশী অর্থের ওপর প্রমাণ বহন করে। আবার প্রত্যেকটি (সিফাত) সমর্থক শব্দ নয়। আর যদি মুশতাক (ক্রিয়া থেকে গঠিত বিশেষ্য) কোনো জিনিসের ওপর প্রয়োগ হয়, তাহলে যেই মূল থেকে মুশতাক গঠিত হয়েছে তার অর্থও মুশতাকের ভেতর পাওয়া যাওয়ার দাবি করে। কাজেই তাঁর জন্যে ইলম, কুদরত, হায়াত প্রভৃতির সিফাত সাব্যস্ত হলো। মুতাযেলারা যেমন ধারনা করে তেমন নয় যে, তিনি আলিম তাঁর কোনো ইলম নেই, ক্ষমতাশীল তাঁর কোনো ক্ষমতা নেই প্রভৃতি। কেননা তা প্রকাশ্য অসম্ভব আমাদের কথার ন্যায় যে, তিনি কালো কিন্তু তার কালো রং নেই। অথচ নাসগুলো তাঁর ইলম, কুদরত প্রভৃতি সাব্যস্ত হওয়ার কথা স্পষ্ট বলেছে। তারা আরো বলেন, "তিনি কালাম দ্বারা বিশেষিত এ ছাড়া তাঁর আর কোনো অর্থ নেই।"

আর তারা সকল ফি'লী সিফাতকে তাকওয়ীনের সিফাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়েছে আর সকল ফি'লী সিফাতও আল্লাহ তা'আলার জন্যে হাকিকি সিফাত নয়। বস্তুত তা কেবল তাকওয়ীন সিফাতের

সংশ্লিষ্ট বিষয়। তাকওয়ীন হলো আদি সিফাত আর তাই হলো অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে নিয়ে আসার মূল কারণ তাদের নিকট।

তার কতক উদাহরণ:

আল্লাহ তা'আলার ওপরে হওয়ার সিফাত: মাতুরীদিয়্যারা আল্লাহ তা'আলার তাঁর আরশের ওপরে হওয়া ও বান্দাদের থেকে তাঁর ঊর্ধ্বে হওয়ার নসগুলো থেকে বুঝেছে যে, এর বাহ্যিক অর্থ থেকে আবশ্যক হয় আল্লাহ তা'আলা কোনো এক দিকে আছেন এবং তিনি বস্তু দ্বারা বেষ্টিত আছেন। আর এসব হলো মাখলুকের সিফাত[১৩৬], আর যে কোনো এক দিকে থাকেন, তখন তার মাঝে ও দিকের মাঝে নির্দিষ্ট দূরত্ব থাকা জরুরী। আর কল্পনায় আসে যে, তিনি হয়তো দিক থেকে বেশী হবেন অথবা তার চেয়ে কম হবেন অথবা তার বরাবর হবেন[১৩৭], আর তিনি যদি দিকে থাকেন, তাহলে স্থান, দিক ও বেষ্টনকারী জায়গার আদি হওয়া আবশ্যক হয়। আরো আবশ্যক হয় তার শরীরী হওয়া, বিভিন্ন অংশে গঠিত হওয়া অথবা নানা আপদ-বিপদের স্থান হওয়া[১৩৮], অধিকন্তু: তিনি হয়তো বেষ্টনকারীর সমান হবেন অথবা তার থেকে হ্রস্য হবেন, তাহলে তিনি সসীম হলেন, অথবা তার চেয়ে অধিক হবেন, তাহলে তিনি বিষ্টেনকারী হলেন[১৩৯]।

তারা এই সন্দেহের ভিত্তিতে (আল্লাহর)উপরে হওয়ার দলীলগুলোকে বিকৃত ও উপরে হওয়ার সিফাতকে বাতিল করে দিয়েছে আর আল্লাহকে তার জন্য কতিপয় নিষেধ সিফাত দ্বারা বিশেষিত করেছে। যেমন তারা বলেছে, আল্লাহ জগতের ভেতরে নয় বাইরেও নয় এবং জগতের সঙ্গে মিলিত নয় আবার জগত থেকে পৃথকও নয়[১৪০], তিনি ছয় দিকের ভেতর নয়, ওপরে নয়, নিচে নয়, উত্তরে নয়, দক্ষিণে নয়, সামনে নয় ও পিছনেও নয় [১৪১]। তিনি আরশের উপরেও নন, তা ছাড়া অন্য কিছুর উপরেও নন এবং

আরশের উর্ধেও নন [১৪২], এমনকি আল্লাহ জগতের ওপরেও নন[১৪৩] আর যারা আল্লাহ তা‘আলাকে আসমানের উপরে আছেন অথবা তিনি উর্ধে আছেন বলে বিশেষিত করেন, তাদেরকে তারা কাফির বলেন[১৪৪]।

তারা আল্লাহ তা‘আলার নিজ মাখলুকের ওপরে হওয়া ও নিজ বান্দাদের থেকে উর্ধ্বে হওয়া সংক্রান্ত কিতাব ও সুন্নাহের নসগুলোর বাতিল ব্যাখ্যা করেন, যেমন (তাদের নিকট তার অর্থ হলো) আধিপত্য, দখল করা,স্থানসমূহ থেকে উর্ধে [১৪৫],উচ্চপ্রভাব বিস্তার করা, বিজয়ী হওয়া,উচ্চ মর্যাদাবান হওয়া[১৪৬], প্রভুত্ব ও বড়ত্বের উচ্চতা [১৪৭] প্রভৃতি বাতিল ব্যাখ্যাসমূহ।

তাদের অপব্যাখ্যার একটি উদাহরণ হলো কালামের সিফাত: তারা যখন কালামের সিফাতে চিন্তা করেন তখন তাদের বিবেকে প্রথম প্রবেশ করে "উপকারণ ও অঙ্গসমূহ" [১৪৮] অর্থাৎ জিহ্বা, মুখ, দুই ঠোঁট, দাঁত ও গলা এবং তা আল্লাহ তা‘আলার বিপদ-আপদ ও বিভিন্ন অবস্থার মুখাপেক্ষী হওয়াকে আবশ্যক করে[১৪৯]।

আর তারা আল্লাহর কালামের(কথার) সিফাতকে বাতিল করে দেয় এবং কালামে নাফসী(বর্ণ-শব্দ ব্যতীত অন্তর কেন্দ্রিক কথা) নামক বিদআতি কথা বলে। তাদের কতক তো আল-কুরআনুল কারীম মাখলুক হওয়ার বিদআতি কথা স্পষ্ট বলেছেন এবং এই মাসআলায় তাদের মাঝে ও মুতাযেলাদের মাঝে কোনো বিরোধ নেই।

তাফতাযানী বলেন, "অতঃপর আমাদের মাঝে ও তাদের—মুতাযেলাদের—মাঝে বিরোধের মূল বিষয়টি প্রত্যাবর্তন করে কালামে নাফসী সাব্যস্ত করা ও না করার দিকে। অন্যথায় আমরা শব্দ ও অক্ষরসমূহকে কাদিম (আদি) বলি না আর তারা কালামে নাফসীকে মাখলুক বলেন না।" [১৫০]

বুতি আশায়েরাহ ও মুতাযেলাদের মাযহাব নকল করতে গিয়ে বলেন: “অতঃপর মুসলিমরা আল্লাহ তা‘আলার জন্যে যা সাব্যস্ত করার ব্যাপারে একমত হয়েছেন মুতাযেলারা তা হরফ ও আওয়াজ দ্বারা ব্যাখ্যা করেন, যা কিনা আল্লাহ তা‘আলা অপরের মাঝে সৃষ্টি করেন, যেমন, লাওহে মাহফুয ও জিবরীল। আর জানা কথা যে, এগুলো পরে সৃষ্ট কাদিম-আদি নয়। অতঃপর তারা আল্লাহর জন্যে ‘কালাম’ শিরোনামের অধীনে এসব অক্ষর ও আওয়াজের বাইরে কিছুই সাব্যস্ত করেনি।

পক্ষান্তরে জমহুর মুসলিমগণ(আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ অর্থাৎ তার দৃষ্টিতে আশায়েরাহ ও মাতুরীদিয়্যাহরা)বলেনঃমুতাযেলারা এই যা বলে আমরা তা অস্বীকার করি না,বরং আমরা তা স্বীকার করি এবং তাকে লাফযী কালাম (শব্দগত কথা)নামে অভিহিত করি।আর আমরা সবাই তার নতুন সৃষ্ট হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য এবং তা আল্লাহর সত্তার সঙ্গে কায়েম নয়,কেননা তা হলো নতুন। তবে আমরা তার পশ্চাতে একটি বিষয় সাব্যস্ত করি,আর তা হলো নফসের সঙ্গে কায়েম সিফাত,যেটিকে শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়।আর তা ইলম ও ইচ্ছার হাকিকত ছাড়া অন্য কিছু”[১৫১]।

তার ওপর আরেকটি উদাহরণ হলো, আখিরাতে চোখের দ্বারা মুমিনদের স্বীয় রবকে দেখা:

তারা আল্লাহ তা‘আলাকে দেখার মাসআলায় কিছু শর্ত ও কিছু নেতিবাচক বিধিনিষেধ আরোপ করেন, কেননা তাদের বিবেকে দ্রুত চলে আসে শরীরের দর্শন। আবূল মানসূর মাতুরীদী বলেনঃ “যদি বলা হয়: কিভাবে দেখা যাবে? বলা হবে: আকৃতি ছাড়াই দেখা যাবে। কেননা আকৃতি হয় চেহারা বিশিষ্ট্য বস্তুর, বরং দাঁড়ানো, বসা, হেলান দেয়া, লটকে থাকা, মিলিত, পৃথক, সামনা-সামনি ও পিছাপিছি, খাঁটো, লম্বা, আলো, অন্ধকার, স্থীর, চলনশীল, স্পর্শকৃত, আলাদাকৃত, ভেতর

ও বাহির ছাড়াই তাকে দেখা যাবে। এবং তাকে এমন কোনো অর্থেও দেখা যাবে না, যা ধারনা গ্রহণ করতে পারে অথবা বিবেক যার পরিমাণ করতে পাারে, কেননা আল্লাহ তা‘আলা তার থেকে অনেক ঊর্ধ্বে।” [১৫২]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ তাদের ব্যাপারে ফয়সালা করেছেন যে, তারা —এসব শর্ত ও বিধিনিষেধের ফলে—আল্লাহ তা‘আলার দর্শনকে অসম্ভব বানিয়ে ফেলেছে [১৫৩],

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ মুমিনদের স্বীয় রবকে দেখার ব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ نَّاضِرَةٌ ٢٢ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٞ ٢٣﴾ [القيامة: 22-23]

সেদিন কোনো কোনো মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে। [আল-কিয়ামাহ: ২২-২৩] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿۞لِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ ٱلۡحُسۡنَىٰ وَزِيَادَةٞۖ وَلَا يَرۡهَقُ وُجُوهَهُمۡ قَتَرٞ وَلَا ذِلَّةٌۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٦﴾ [يونس: 26]

“যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্যে রয়েছে শুভ পরিণাম (জান্নাত) এবং আরো বেশী (আর তা হলো আল্লাহর মহিমান্বিত চেহারার দর্শন)।” [ইউনুস: ২৬] আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿كَلَّآ إِنَّهُمۡ عَن رَّبِّهِمۡ يَوۡمَئِذٖ لَّمَحۡجُوبُونَ ١٥﴾ [المطففين: 15]

কখনো নয়; নিশ্চয় সেদিন তারা তাদের রব হতে আড়ালে থাকবে[১৫]; কাফিরদের আল্লাহ তা‘আলা থেকে আড়ালে থাকা মুমিনদের তাদের মহান রব তা‘আলাকে দেখার ওপর প্রমাণ বহন

করে। সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জান্নাতীদের যখন জান্নাতে দাখিল করা হবে, তখন মহান বরকতময় আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা কী চাও যে, আমি তোমাদের আরো বেশি দিই?' তারা বলবে, 'তুমি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল কর নি? তুমি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট কর নি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও নি?' তিনি বলেন, অতঃপর আল্লাহ পর্দা সরিয়ে দিবেন (এবং তারা তাঁর চেহারার দর্শন লাভ করবে,তখন তারা উপলব্দি করবে) তাদের এমন কোনো জিনিস প্রদান করা হয় নি যা তাদের নিকট তাদের রবকে দেখা অপেক্ষা বেশি প্রিয়।

জারীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসে ছিলাম। আচমকা তিনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকালেন আর বললেন, "তোমরা শীঘ্রই তোমাদের রববকে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা এ চাঁদটিকে দেখতে পাচ্ছ। অথচ এটিকে দেখতে তোমাদের কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। অতএব, যদি তোমরা পার যে, সূর্য উঠার আগের সালাত ও সূর্য ডুবার পরের সালাত আদায়ে পরাজিত হবে না, তাহলে তাই কর।" [১৫৫]

শায়খ আব্দুল গানী আল-মাকদিসী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আহলুল হক, আহলুত তাওহীদ ও সত্যবাদীগণ ঐকমত্য যে, আল্লাহ তা'আলাকে যেভাবে দেখার কথা তার কিতাব ও রাসূল থেকে প্রমাণিত সহীহ বর্ণনায় এসছে সেভাবেই দেখা যাবে।"[১৫৬]

ইবনুল ইজ্জ আল-হানাফী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "সাহাবী ও তাবেঈগণ এবং দীনের ভেতর ইমাম হিসেবে প্রসিদ্ধ ইসলামের ইমামগণ, আহলুল হাদীস ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত মুতাকাল্লিমদের (দার্শনিকদের) সকল জামাত (আখিরাতে) আল্লাহর দিদারকে সাব্যস্ত করেছেন"[১৫৭]।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ঈমানের অন্যান্য রোকন।

এতে তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে:

প্রথম পরিচ্ছেদ: রাসূলদের প্রতি ঈমান আর তাতে দু'টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

প্রথম অনুচ্ছেদ : নবুওয়ত কীসের দ্বারা প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মু'জিযাহ ও কারামাহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শেষ দিবসের প্রতি ঈমান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের প্রতি ঈমান আর তাতে চারটি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

প্রথম অনুচ্ছেদ : ফয়সালা ও তাকদীরের প্রতি ঈমানের স্তরসমূহ।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: বান্দাদের কর্মসমূহ।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : কুদরত (শক্তি) ও ইস্তেতাআত (সামর্থ)।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : সামর্থের বাইরে দায়িত্ব প্রদান।

প্রথম পরিচ্ছেদ: রাসূলদের প্রতি ঈমান

প্রথম অনুচ্ছেদ : নবুওয়ত কীসের দ্বারা প্রমাণিত হয়।

মাতুরীদিয়্যারা মনে করেন যে, রাসূল ও নবীগণের সততা সাব্যস্ত করা রিসালাত লাভের পূর্বে ও পরে তাদের চারিত্রিক ও কায়িক সিফাতসমূহে দৃষ্টি দেয়া এবং আল্লাহ তাদেরকে তাদের সততার

প্রমাণ বহনকারী যেসব মুজিযাহ দ্বারা শক্তিশালী করেছেন তাতে চিন্তা করার ওপর নির্ভরশীল।

আবূ মানসূর মাতুরিদি বলেন, “অতঃপর রাসূলদের পরিচয় প্রকাশে আমাদের নিকট দু’টি বিষয় হলো মূল:

একটি হলো: এমনভাবে তাদের অবস্থা প্রকাশ পাওয়া যে, বিবেক তাদের থেকে সন্দেহকে দূরে করে দেয় এবং তাদের ভেতর ধারনার কল্পনাকে অস্বীকার করে, যেহেতু ছোটকালে ও বড়কালে তারা তাদের সঙ্গী হয়েছে, ফলে তাদেরকে তাদের কওমের মাঝে পবিত্র পরিচ্ছন্ন মুত্তাকী পেয়েছে, যা এ ক্ষেত্রে তাদের মাঝে সমতার সম্ভাবনা রাখে না এবং তাদের শিক্ষা-দীক্ষাও সেই (নবীদের শিক্ষা-দীক্ষা) পর্যন্ত পৌঁছে না, অথচ তাদের অবস্থা তাদের সামনে জাহির ছিল এবং তারা ঘরে ও বাইরে তাদের মাঝেই ছিল। সুতরাং সামগ্রিকভাবে জানা যায় যে, এটি তাঁরই সংরক্ষণ যিনি তাদেরকে একটি সম্মানজনক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং তাদেরকে গায়েব ও গোপনীয়তার ওপর আমানতদার বানাবেন। আর এটি এমন বিষয় (মানুষের) স্বভাব যা গ্রহণ করতে ধাবিত হয় এবং বিবেক তাদের সমস্ত বিষয় সুন্দর জানে, কাজেই তাকে প্রত্যাখ্যানকারী যেন জেনে-বুঝে জেদ ও একগুঁয়েপনা করেই তাকে প্রত্যাখ্যানকারী হবে।

দ্বিতীয়টি হলো: এমন অসম্ভব নির্দশন আগমন করা, যা চক্ষুসমান মানুষের স্বভাবের উর্ধ্বে এবং কোনো শিক্ষার পক্ষে তার মত অনুরূপ বস্তু পেশ করা অথবা তার হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছা অসম্ভব। এতদাসত্ত্বে যদিও সম্ভাবনা থাকে যে, কোনো ব্যক্তি শিক্ষা কিংবা গবেষণার দ্বারা সেই পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম, তবুও তো রাসূলগণ সেই পরিবেশে বড় হননি এবং সেই দীক্ষাও তারা গ্রহণ করেননি! এতেই প্রকাশ পায় যে, তারা তা আল্লাহ থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন এবং আল্লাহ

তাদেরকে তা দিয়ে সম্মানীত করেছেন, যেহেতু তিনি তাদেরকে স্বীয় ওহীর আমানতদার বানাবেন।" [১৫৮]

আর অধিকাংশ মাতুরীদিয়্যা মনে করেন যে, নবীর সততার ওপর মুজিযাহ ব্যতীত কোনো দলিল নেই। এই নীতিতে যে, মুজিযাই কেবল নবীর নবুওয়ত অথবা রাসূলের রিসালাত সাব্যস্ত হওয়ার ওপর ইয়াকিনি (চূড়ান্ত) ইলমের ফায়দা দেয়।

বাযদাওয়ী বলেন, "দলিল ছাড়া রিসালাহ সাব্যস্ত হওয়া কল্পনাই করা যায় না, কাজেই দলিল দ্বারাই সাব্যস্ত হতে হবে। আর সেই দলিল মুজিযা ছাড়া কিছুই নয়। অতএব প্রত্যেক রাসূলের রিসালাহ তাদের দু'হাতে প্রকাশ পাওয়া মুজিযা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে... সুতরাং মুজিযা হলো তাদের রিসালাতের দাবির সত্যতার দলিল। কেননা যা প্রকাশ পেয়েছে তা মানুষের সাধ্যে নেই, তাই জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টিকারী। আর তিনি তা সৃষ্টি করেন যেন তার দাবির সত্যতার দলিল হয়। কেননা প্রত্যেক রাসূলের কওম তার নিকট তার দাবির সত্যতার দলিল চেয়েছেন, ফলে তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছেন, যেন তার কওম তার কাছে যা চেয়েছে তা দিয়ে তাকে শক্তিশালী করা হয়। যখন তাকে তার সত্যতার দলিল দিলেন, যা তার কওম তার কাছে চেয়েছে, তখন সেটিই হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তার সত্যতার দলিল। কেননা আল্লাহ মিথ্যাবাদীকে শক্তিশালী করেন না। এ দিকে মানুষের জন্যে রাসূলদের চেনা অবশ্যই জরুরি, আর মুজিযা ছাড়া চেনার কোনো রাস্তা নেই।" [১৫৯]

সন্দেহ নেই যে, মুজিযা নবীদের নবুওয়ত সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ দলিল, তবে মুজিযা ছাড়া নবীদের নবুওয়ত না চেনা যাওয়ার কথাটি সহীহ নয়। বরং এখানে অন্যান্য অনেক দলিল রয়েছে, যেমন তার (নবীর) ওপর যে ইলম, সত্যতা, কল্যাণ ও বিভিন্ন প্রকার ভালো

কাজ প্রকাশ পায় এবং যেসব অবস্থা তাদের সঙ্গী হয় প্রভৃতি একজন সামান্য বিবেকীর জন্যে তাদের নবুওয়তের দলিল[১৬০]।

যে কোনো মিথ্যাবাদী নবুওয়তের দাবি করেছে অবশ্যই তার ওপর মূর্খতা, মিথ্যা, পাপ এবং তার ওপর শয়তানের প্রভাব বিস্তার করার আলামত সামান্য বিবেকের অধিকারী ব্যক্তির নিকট স্পষ্ট হয়ে গেছে। আর মানুষেরা সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মধ্যে পার্থক্য করে।

এ কারণেই খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জানলেন যে, তিনি সত্যবাদী নেককার। তারপর যখন তার কাছে ওহী আসল তিনি বললেন, "আমি আমার ওপর আশংকা করছি।" তখন খাদিজা তাকে বললেন, "কখনো নয়। আল্লাহর শপথ, আল্লাহ্ কখনো আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়দের খোঁজ-খবর নেন, সত্য কথা বলেন, সহায়হীন লোকদের বোঝা লাঘব করে দেন, মেহমানদের আপ্যায়ন করেন, নিঃস্ব লোকদেরকে উপার্জন করে দেন এবং হকের পথে আসা বিপদাপদে পতিত লোকদেরকে সাহায্য করে থাকেন।" [১৬১] (১০) তিনি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলার আশংকা করেননি, কেননা তিনি নিজের ব্যাপারে জানতেন যে, তিনি মিথ্যা বলেননি, তবে প্রথম অবস্থায় নিজের জন্যে খারাপ কিছু উপস্থিত হওয়ার ভয় করেছেন। আর তা হলো দ্বিতীয় স্তর। ফলে খাদিজা এরূপ কিছু না হওয়ার কারণ উল্লেখ করলেন। আর তা হলো, তাঁর উত্তম চরিত্রের ওপর এবং সুন্দর আচার-আচরণ ও আমলের ওপর সৃষ্ট হওয়া। আর তা হলো সততা, যা মাখলুকের প্রতি ইনসাফ ও ইহসান করাকে আবশ্যক করে। আর যে নিজের নফসে সততা, ইনসাফ ও ইহসানকে জমা করবে আল্লাহ যাদেরকে লাঞ্ছিত করেন সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, মেহমানদারী করা, অক্ষম লোকদের বোঝা বহন করা, নিঃস্বদের দান করা ও হকের পথে

মুসিবতে সাহায্য করা সবচেয়ে বড় নেকি ও ইহসান। আর আল্লাহ তা‘আলার নীতি থেকে জানা গেছে যে, আল্লাহ যাকে প্রশংসিত চরিত্রের ওপর সৃষ্টি করেন ও খারাপ চরিত্র থেকে পবিত্র রাখেন, তাকে তিনি লাঞ্ছিত করেন না।” [১৬২]

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ মু‘জিযাহ ও কারামাহ।

মাতুরীদিয়্যাগণ ওলীদের কারামাত সাব্যস্ত করেন যেমন তারা নবীদের মুজিযাসমূহ সাব্যস্ত করেন। তারা মনে করেন যে, চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া ছাড়া অর্থাৎ রিসালাতের দাবি ছাড়া উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। অতএব মুজিযা হলো বিরোধিতা ছাড়া চ্যালেঞ্জসহ অলৌকিক ঘটনা। আর তাদের নিকট কারামত হলো চ্যালেঞ্জ ছাড়া অলৌকিক ঘটনা। তারা আরো মনে করে যে, মুজিযাহ ও কারামাত সাব্যস্ত করার মাঝে কোনো বৈপরীত্ব নেই, বরং ওলীর কারামাতও নবীর মুজিযার অংশ এবং তার সত্যতার ওপর দলিল। কেননা অনুসারীর কারামত মূলত অনুসরণকৃত ব্যক্তিরই কারামাত। আর ওলী কখনো ওলী হতে পারবে না নবীকে সত্যারোপ ও তার অনুসরণ করা ছাড়া। আবূল মুয়ীন আন-নাসাফী মুজিযার সংজ্ঞা স্পষ্ট করে বলেন, মুতাকাল্লিমদের (দার্শনিকদের) নীতিতে মুজিযার সংজ্ঞা হলো: দুনিয়ার জগতে নবুওয়তের দাবীকারীর সত্যতা প্রকাশের জন্যে আর যে তার বিপক্ষে তার মতই জিনিস পেশ করার চ্যালেঞ্জ প্রদান করবে তাকে পরাস্ত ও শাস্তি প্রদানসহ স্বভাব বিরোধী বিষয় প্রকাশ পাওয়া। (দুনিয়ার জগত) হওয়া শর্ত, কারণ আখিরাতের জগতে যেসব অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পাবে তা মুজিযাহ হবে না। আর আমরা বলেছি (নবুওয়তের দাবীকারীর সত্যতা প্রকাশ করার জন্যে), যাতে উলূহিয়্যার দাবিকারী যা প্রকাশ করে তার থেকে পরহেয হয়। কেননা আমাদের নিকট তার হাতে তা প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। আর আমরা বলেছি, (তার সত্যতা প্রকাশ করার জন্যে), কারণ

সেটি যদি তার মিথ্যা প্রকাশ করার জন্যে হয়, তাহলে তার জন্যে তা মুজিযাহ হবে না এবং তা তার সত্যতার ওপর দলিলও হবে না, বরং সেটি তার দাবির মিথ্যার ওপর দলিল হবে। আর আমরা বলেছি, (আর যে তার বিপক্ষে তার মতই জিনিস পেশ করার চ্যালেঞ্জ প্রদান করবে তাকে পরাস্ত ও শাস্তি প্রদানসহ), কেননা অলৌকিক ঘটনা যদি নবীর হাতে প্রকাশ পায় অতঃপর তার প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদানকারীর হতেও তা প্রকাশ পায়, তাহলে প্রতিযোগিতার সময় তা মুজিযা হওয়া থেকে বাদ পড়ে যাবে, কারণ যে তাকে মিথ্যারোপ করে তার হাতেও একই জিনিস প্রকাশ পেয়েছে, যা তাকে মিথ্যারোপ কারীর সত্য হওয়ার দলিল, ফলে উভয় দলিল সাংঘর্ষিক হবে এবং উভয় দলিল বাতিল সাব্যস্ত হবে[১৬৩]।

নাসিরী বলেন, নবী ও ওলীর মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট। কেননা নবী মুজিযা ও কারামাতের দাবি করেন এবং তার দ্বারা সৃষ্টিকুলের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। তিনি বলেন, আমার রিসালাতের নিদর্শন ও প্রমাণ অমুক অমুক। পক্ষান্তরে ওলী কারামাতের দাবি করেন না, তবে কোনো দাবি ও চ্যালেঞ্জ ছাড়াই তার হাতে তা প্রকাশ পায়। আর যখনই সে তা দাবি করবে বিলায়েতের স্তর থেকে পড়ে যাবে এবং সে ফাসিক পরিগণিত হবে। এমনটিই উল্লেখ করেছেন উসূলের আলেমগণ, তাদের একজন হলেন সাইফুল হক আবূল মুয়ীন...” [১৬৪]

মাতুরীদিয়্যাদের মুজিযার সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট হয় যে, তাদের নিকট তিনটি শর্তে নবুওয়ত সাব্যস্ত হয়: সাভাবিকতা বিরোধী হওয়া, চ্যালেঞ্জ যুক্ত থাকা ও বিরোধিতা না থাকা। বস্তুত এই শর্তগুলো মুজিযার জন্যে পাকাপোক্ত নয়। তার কারণ হলো:

- কিতাব ও সুন্নাহে (মুজিযার) হুকুম এই বিশেষণের সঙ্গে যুক্ত নয়, বরং সাভাবিকতা বিরোধী হওয়ারও উল্লেখ নেই, তবে তাতে রয়েছে নিদর্শন ও দলিলসমূহ[১৬৫]।

- মুজিযার অভ্যাস বিরোধী হওয়া এমন বিশেষণ যা খাপ খায় না, কেননা খোদ নবুওয়ত হলো নবীদের স্বভাবগত বিষয়, তবে অন্যদের বিবেচনায় তা স্বভাবগত নয়।

জাদু ও তেলেসমাতি গণক ও জাদুকরের জন্যে স্বভাবগত, তবে অন্যদের জন্যে তা স্বভাবগত নয়। যেমন চিকিৎসকেরা এমন জিনিস জানেন যা তাদের ন্যায় চিকিৎসকদের জন্যে স্বভাবগত, তবে অন্যদের জন্যে তা স্বভাবগত নয়, কাজেই মুজিযার স্বভাবগত না হওয়া তেমন যুৎসই বিষয় নয়[১৬৬]।

অতএব মাতুরীদিয়্যাদের মুজিযাকে এই সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা সঠিক ও যুৎসই নয়। অধিকন্তু আল্লাহ নবীদের যা দিয়ে শক্তিশালী করেন কিতাব ও সুন্নাহের কোথাও তাকে মুজিযা বলা হয়নি, বরং তাকে নামকরণ করা হয়েছে আয়াত (নিদর্শন) বলে। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক নবীকে তাঁর যুগের প্রয়োজন মুতাবিক কিছু নিদর্শন (আয়াত) দান করা হয়েছে, যা দেখে লোকেরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে। আমাকে যে আয়াত (নিদর্শন) দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে, ওয়াহী- যা আল্লাহ্ আমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। আমি আশা করি যে, কিয়ামতের দিন অনুসারীদের অনুপাতে তাদের চেয়ে আমি অধিক হবো[১৬৭]।

আয়াতের সংজ্ঞা এভাবে করা যায় যে, আল্লাহ তা‘আলা তার নবী ও রাসূলদের পার্থিব সাধারণ নীতি বিরোধী যেসব জিনিস দিয়ে শক্তিশালী করেন এবং যার মত কিছু পেশ করা কোনো মাখলুকের ক্ষমতায়

নেই। এই আয়াত হলো তাদের সত্যতার দলিল ও আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে শক্তিশালীকরণ।

আর ওলীদের কারামাত। এটি তারা যেমন বলেছে নবীগণের আয়াতের অংশ বিশেষ। তবে যা কিছু নবীদের আয়াত হবে তার সবই নেককার লোকদের কারামাত হওয়া জরুরি নয়।

মাতুরীদিয়্যারা এর মাঝে ও তার মাঝে বরাবর করে ফেলেছেন। আর তারা বলেন, পার্থক্য কেবল নবুওয়তের দাবী ও চ্যালেঞ্জ। এটি ভুল। কেননা নবীগণের নিদর্শনাবলী যা তাদের নবুওয়তের ওপর প্রমাণ বহন করেছে, তা সেসব থেকে অনেক উর্ধ্বের যেখানে তারা ও তাদের অনুসারীরা অংশীদার। যেমন চাঁদের দ্বিখণ্ড হওয়া, কুরআন নিয়ে আসা, লাঠির সাপে পরিণত হওয়া ও পাথর থেকে চতুষ্পদ জন্তুর বের হওয়ার মত নিদর্শনগুলো ওলীদের জন্যে ছিল না। কাজেই বড় বড় আয়াত নবী ও রাসূলগণের সঙ্গেই খাস। তবে ছোট নিদর্শনগুলো কখনো কখনো নেককারদের জন্যে হয়,যেমন খাবার অধিক হওয়া। এটি কতক নেককার থেকে পাওয়া গেছে। তবে তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে যেভাবে পাওয়া গেছে সেভাবে কারো থেকে পাওয়া যায়নি,যেমন তিনি অল্প জিনিস একটি বাহিনীকে খাইয়েছেন। কখনো একই জাতীয় নিদর্শনে নবী ও অন্যরাও অংশীদার থাকতে পারে,তবে বড়ত্বে ও মহত্বে এক হবে না[১৬৮]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শেষ দিবসের প্রতি ঈমান।

মাতুরীদিয়্যারা আখিরাত সংক্রান্ত মাসআলাগুলোকে সামইয়্যাত (শ্রবণ নির্ভর) বলে নামকরণ করেন, যেহেতু এই মাসআলাগুলো শ্রবণ করা ছাড়া জানা যায় না। অর্থাৎ তাদের নিকট আখিরাত সংক্রান্ত বিষয়গুলো জানার একমাত্র উৎস হলো শ্রবণ (বর্ণনা)। আর

এই জন্যেই দেখি যে, এই অধ্যায়ে তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সঙ্গে একমত হয়েছে। ফলে তারা কবরের নিআমত ও তার আযাব, কিয়ামতের নিদর্শন, পুনরুত্থান, পুনঃজীবন, মিযান, পুলসিরাত ও হাউজ [১৬৯] সাব্যস্ত করেছেন। তবে তাদের বিশ্বাস যে, আখিরাত এবং তার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো শ্রবণ ছাড়া জানা যায় না সঠিক নয়। বরং বিবেকও আখিরাতকে প্রমাণ করে যেমন প্রমাণ করে শ্রবণ। বরং শ্রবণ খুব বিনীতভাবে বিবেকের দলিলের দিকে পথপ্রদর্শন করেছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলার বাণীতে রয়েছে:

﴿إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ لَأٓيَٰتٖ لِّأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٩٠ ٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمۡ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هَٰذَا بَٰطِلٗا سُبۡحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٩١ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدۡخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدۡ أَخۡزَيۡتَهُۥۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ١٩٢﴾ [آل عمران: 190-192]

আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে, বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য। (১৯০) যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও কাত হয়ে এবং আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে। (বলে) ‘হে আমাদের রব, তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র মহান। সুতরাং তুমি আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা কর’(১৯১)। ‘হে আমাদের রব! আপনি কাউকেও আগুনে নিক্ষেপ করলে তাকে তো আপনি নিশ্চয়ই হেয় করলেন এবং যালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।’ (১৯২) [আলে ইমরান: ১৯০-১৯২]

আর আল্লাহর দিদার যেহেতু আখিরাতের দিবস সম্পর্কিত তাই মাতুরীদিয়্যারা তা সাব্যস্তের কথা বলেন, কেননা শ্রবণ তার ওপর প্রমাণ বহন করে এবং বিবেকের কাছেও তা বৈধ। তবে দিক ও মুখোমুখি না হওয়ার শর্ত করেন তারা। এর কারণ, তারা আল্লাহ থেকে

সত্ত্বার ওপর হওয়াকে নাকচ করেন, ফলে তার ওপরে না হওয়া ও তার দর্শন সাব্যস্ত করার মাঝে জমা করতে বাধ্য হয়েছে।

আবূল মানসুর মাতুরীদি বলেনঃ "আমাদের নিকট রবের দিদার আয়ত্তে আনা ও ব্যাখ্যা করা ছাড়াই হক ও অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহর দিদারের ওপর দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿لَّا تُدۡرِكُهُ ٱلۡأَبۡصَٰرُ وَهُوَ يُدۡرِكُ ٱلۡأَبۡصَٰرَۖ...﴾ [الأنعام: 103]

(চক্ষুসমূহ তাকে আয়ত্ত করতে পারে না। আর তিনি চক্ষুসমূহকে আয়ত্ত করেন।) [আল-আন'আম: ১০৩] যদি তাকে দেখা না-ই যেত, তবে ইদরাক (আয়ত্তে নিয়ে আসা) না করার মাঝে কোনো হিকমত থাকত না। দ্বিতীয়: মূসা আলাইহিস সালামের কথা:

﴿... قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرۡ إِلَيۡكَۚ ...﴾ [الأعراف: 143]

(হে আমার রব, আপনি আমাকে দেখা দিন, আমি আপনাকে দেখব।) [আল-আরাফ : ১৪৩] যদি দিদার বৈধ না হত, তাহলে এই প্রশ্ন রব সম্পর্কে তার মূর্খতার পরিচয় হত। আল্লাহ তাআলার আরো বাণী:

﴿وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ نَّاضِرَةٌ ٢٢ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٞ ٢٣﴾ [القيامة: 22-23]

(সেদিন কোনো কোনো মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে(২২), তাদের রবের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপকারী হবে (২৩)) [আল-কিয়ামাহ: ২২-২৩]" [১৭১]

অতঃপর বলেন: "যদি বলা হয়: কিভাবে দেখা যাবে? বলা হবে: বিনা আকৃতিতে, কেননা চেহারা বিশিষ্ট্যের জন্যেই আকৃতি হয়, বরং তাকে দাঁড়ানো, বসা, হেলান দেয়া, লটকে থাকা, মিলিত ও পৃথক থাকা, সামনা-সামনি ও পশ্চাৎমুখী হওয়া, খাটো ও লম্বা হওয়া, আলো ও অন্ধকারে থাকা, স্থীর ও চলনশীল থাকা, স্পর্শকৃত ও বিচ্ছিন্নকৃত থাকা, ভেতরে ও বাহিরে থাকা ছাড়াই দেখা যাবে। এবং এমন কোনো

অর্থেও দেখা যাবে না, যা কল্পনা করা যায় অথবা বিবেক যার পরিমাণ করতে পারে, কেননা তার থেকে আল্লাহ তা'আলা অনেক ঊর্ধ্বে।"[১৭২]

মাতুরীদিয়্যাদের কথার হাকিকত হলো,তারা এমন জিনিস সাব্যস্ত করেছে যা দেখা সম্ভবপর নয়, কারণ তারা "দু'টি বিপরীত বস্তুকে একত্র করেছে। কেননা যা জগতের ভেতরে হবে না এবং তার বাইরেও হবে না এবং যার দিকে ইশারাও করা যাবে না, তাকে চোখে দেখা অসম্ভব। আর যদি তার অস্তিত্ব বাইরে সম্ভবপর হয়, তাহলে তা কিভাবে?! কেননা তা তো অসম্ভব ! হ্যাঁ, বাস্তবে তার অস্তিত্ব ছাড়া মাথায় কল্পনা করা যায় কেবল। প্রকৃত প্রস্তাবে তা একটি ভ্রম ও বাতিল ধারণা মাত্র।"[১৭৩]

এই মাসআলায় মাতুরীদিয়্যাদের কথার প্রত্যাখ্যান [১৭৪] এবং কিয়ামতের দিন মুমিনগণ তাদের রবকে দেখবেন মর্মে কুরআন ও সুন্নাহের দলিলের কারণে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ঐকমত্য হওয়ার আলোচনা গত হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ফয়সালা ও তাকদীরের প্রতি ঈমান।

ফয়সালা ও তাকদীরের প্রতি ঈমান আনা ঈমানের রোকনসমূহের একটি রোকন।এটি ছাড়া ঈমান বিশুদ্ধ হবে না।এর চারটি স্তর রয়েছে:

১- প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে আল্লাহর আদি ইলম রয়েছে এবং তিনি বান্দাদের আমলসমূহ তাদের কাজে পরিণত করার আগেই জানেন।

২- ওই ইলম লাওহে মাহফূযে লিখিত রয়েছে।

৩- আল্লাহর সাধারণ ইচ্ছা এবং তাঁর ব্যাপক (সর্বব্যাপী) ক্ষমতা।

৪- আল্লাহ সকল মাখলুক সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি একাই স্রষ্টা আর তিনি ছাড়া সব কিছু মাখলুক।

এটাই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের কথা এবং তার ওপরই প্রমাণ বহন করে কিতাব, সুন্নাহ, সাহাবী ও সুন্দরভাবে তাদের অনুসারী তাবেঈদের ঐকমত্য [১৭৫]

আল্লাহ তা'আলা বলেন

﴿إِنَّا كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَٰهُ بِقَدَرٖ ٤٩﴾ [القمر: 49]

, নিশ্চয় আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে, [আল-কামার: ৪৯] **আল্লাহ তা'আলা বলেন,**

﴿... وَخَلَقَ كُلَّ شَيۡءٖ فَقَدَّرَهُۥ تَقۡدِيرٗا ٢﴾ [الفرقان: 2]

(তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা নিপুণভাবে নিরূপণ করেছেন।) [আল-ফুরকান : ১-২] **"অর্থাৎ তিনি ছাড়া প্রত্যেক বস্তু সৃজিত ও প্রতিপালিত। তিনিই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা, প্রতিপালক, মালিক ও মাবূদ। প্রত্যেক বস্তু তার কর্তৃত্ব, পরিচালনা, আনুগত্য ও ব্যবস্থাপনার অধীন রয়েছে।"** [১৭৬]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿... وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ مَفۡعُولٗا ٣٧ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنۡ حَرَجٖ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥۖ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلُۚ وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ قَدَرٗا مَّقۡدُورًا ٣٨﴾ [الأحزاب: 37-38]

আর আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর হয়ে থাকে। নবীর জন্য সেটা (করতে) কোনো সমস্যা নেই যা আল্লাহ বিধিসম্মত করেছেন তার জন্য। আগে যারা চলে গেছে তাদের ক্ষেত্রেও এটাই ছিল আল্লাহর বিধান। আর আল্লাহর ফয়াসালা সুনির্ধারিত, অবশ্যম্ভাবী। [আল-

আহযাব: ৩৭-৩৮] "অর্থাৎ তাঁর নির্ধারিত বিষয় অবশ্যই সংঘটিত হয়। তার থেকে পশ্চাতপসরণ করা ও ফিরে আসার কোনো সুযোগ নেই। তিনি যা চেয়েছেন হয়েছে আর তিনি যা চাননি হয়নি।" [১৭৭]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ١١﴾ [التغابن: 11]

(আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদই আপতিত হয় না এবং কেউ আল্লাহর উপর ঈমান রাখলে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আর আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।) (আত-তাগাবুন: ১১) "এটি সকল মুসিবতের জন্যে ব্যাপক, নফসে হোক, সম্পদে হোক, সন্তানে হোক, প্রিয়জনদের মাঝে হোক বা অন্য কিছুতে হোক। কাজেই বান্দাদের যা কিছু স্পর্শ করে তা আল্লাহর ফয়সালা ও নির্ধারণের ফলেই স্পর্শ করে। এই বিষয়ে তার ইলম গত হয়েছে, এটি তার কলম লিখেছে এবং তার ইচ্ছা এটি কাজে পরিণত করেছে ও তার হিকমত তা দাবি করেছে।" [১৭৮]

ওমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, ঈমান সম্পর্কে জিবরীল আলাইহিস সালামের প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (তোমার ঈমান আনা আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশ্তাদের প্রতি, তার কিতাবসমূহের প্রতি, তার রাসূলগণের প্রতি ও আখিরাত দিবসের প্রতি আর তোমার ঈমান আনা ভালো ও মন্দ তাকদীরের প্রতি। তিনি —জিবরীল— বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন।) [১৭৯] এই হাদীসে রয়েছে যে, তাকদীরের প্রতি ঈমান আনা ঈমানের উল্লিখিত ছয়টি মৌলিক বিষয়ের একটি। কাজেই যে তাকদীরের ভালো ও মন্দের প্রতি ঈমান আনলো না, সে দীনের একটি নীতি ছেড়ে দিল ও তা অস্বীকার করল। সুতরাং সে

তাদের একজনের মত হলো যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿...أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖۚ...﴾ [البقرة: 85]

(তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর?) [আল-বাকারাহ: ৮৫]" [১৮০]

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, (কোনো বান্দাই মু'মিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না সে তাকদীর ও তার ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনবে। এমনকি তার নিশ্চিত বিশ্বাস থাকতে হবে যে, যা কিছু ঘটেছে তা কিছুতেই না ঘটে থাকত না এবং যা কিছু ঘটে নাই তা কখনো তাকে স্পর্শ করবে না।)[১৮১]

প্রথম অনুচ্ছেদঃ মাতুরীদিয়্যাদের নিকট ফায়সালা ও তাকদীরের স্তরসমূহ:

মাতুরীদিয়্যারা সাব্যস্ত করেন: ইলম, কিতাবাহ, ব্যাপক ইচ্ছা ও সৃষ্টি করার স্তরসমূহ। আর তাদের থেকে ফয়সালা ও তাকদীরের ভেতর যে বিচ্যুতি সংগঠিত হয়েছে তা হলো বান্দাদের কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়ে। আর এই চার স্তর বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আলোচনার ন্যায় তাদের আলোচনা স্পষ্ট নয়। তারা যখন ফয়সালা ও তাকদীরের সংজ্ঞা বর্ণনা করেন তখন শুধু ইলম ও খালকের বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন। আর মাশইয়ার (ইচ্ছার) বিষয়টি উল্লেখ করেন ইরাদার আলোচনার অধীনে। আর কিতাবার (লিখনীর) আলোচনা খুব কম করেন।

মাতুরীদী বলেনঃ "ফয়সালার হাকিকত হলো কোনো জিনিসের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং তার সঙ্গে যা উপযুক্ত ও যার ওপর

তাকে ফিট করা বেশী উপযুক্ত তার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। তিনি একবার বস্তুসমূহ সৃষ্টি করার দিকে গিয়েছেন, কেননা তা হলো বস্তু যেভাবে আছে সেভাবেই তার হওয়া আর প্রত্যেক বস্তুকে যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে সেভাবে হওয়াই তার জন্যে উত্তম। কেননা যিনি মাখলুক সৃষ্টি করেন, তিনি হিকমতপূর্ণ ও সব জান্তা। আর হিকমতের দাবি হলো প্রত্যেক বস্তুতে হাকিকত পৌঁছানো এবং তাকে তার স্থানে স্থাপন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَقَضَىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَاتٍ ...﴾ [فصلت: 12]

(তারপর তিনি আসমানসমূহকে সাত আসমানে পরিণত করলেন।) [ফুসসিলাত:১২] এর ভিত্তিতে মাখলুকের কর্মসমূহকে বিশেষিত করা বৈধ হয় যে, তিনি তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন ও সুগঠিত করেছেন। অতঃপর বলেন: "আর তাকদীর হলো দু'প্রকার: একটি হলো: সেই সীমা যার ওপর কোনো জিনিস সৃজিত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু যে ভালো ও মন্দ এবং সুন্দর ও অসুন্দরের ওপর রয়েছে তার ওপরই তাকে রাখা। এর দলিল আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّا كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَٰهُ بِقَدَرٍ ٤٩﴾ [القمر: 49]

নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে, [আল-কামার: ৪৯]

দ্বিতীয়টি হলো: প্রত্যেক বস্তু যে সময় ও স্থানে এবং যে হক ও বাতিলের ওপর সংগঠিত হবে এবং তার যে সাওয়াব ও শাস্তি রয়েছে তার বর্ণনা দেয়া।" [১৮২]

তিনি আরও বলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে যিনি নিজ কুদরতে মাখলুক সৃষ্টি করেছেন এবং পূর্ব-ইলম ও ইচ্ছার ভিত্তিতে

তার হিকমত মোতাবেক তাদেরকে পরিচালনা করেছেন। আর বস্তুসমূহকে যেভাবে চেয়েছেন সেভাবেই তৈরি করেছেন।

﴿لَا يُسۡـَٔلُ عَمَّا يَفۡعَلُ وَهُمۡ يُسۡـَٔلُونَ ٢٣﴾ [الأنبياء: 23]

তিনি যা করেন সে বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না; বরং তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করা হবে। [আল-আম্বিয়া: ২৩]" [১৮৩]

আবূল মুয়ীন আন-নাসাফী আল্লাহর কিতাবাহ (লিখনী) সাব্যস্ত করে বলে েন, "আল্লাহ তা'আলা যা কিছু হবে এবং বান্দাগণ যা কিছু করবে তা সব তাদের সৃষ্টির পূর্বে লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন।" [১৮৪]

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ বান্দাদের কর্মসমূহ।

এই মাসআলায় আলোচনার দুটি দিকঃ

প্রথম দিকঃ বান্দাদের কর্মসমূহের সৃষ্টি।

মাতুরীদিয়্যাগণ বলেন, নিশ্চয় বান্দাগণের সকল কর্ম আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি এবং আল্লাহ তা'আলাই তা সব সৃষ্টি করেছেন ভালো হোক বা খারাপ হোক। এর ওপর তারা অনেক বর্ণনাগত ও বিবেকি (আকলি) দলিল পেশ করেছেন।

মাতুরীদী বলেন, "অতঃপর 'বান্দাদের কর্ম মাখলুক বলা আবশ্যক' এর ওপর আমাদের নিকট কুরআনের নির্দেশনা থেকে দলিল হলো আল্লাহর বাণী:

﴿وَأَسِرُّواْ قَوۡلَكُمۡ أَوِ ٱجۡهَرُواْ بِهِۦٓۖ إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٣ أَلَا يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ ١٤﴾ [الملك: 13-14]

আর তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তরসমূহে যা আছে তা সম্পর্কে সম্যক অবগত। (১৩) যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত। (১৪) [আল-মুলক: ১২-১৪] **যা প্রকাশ করা হয় ও যা গোপন করা হয় তার স্রষ্টা যদি আল্লাহ তা'আলা না হতেন, তাহলে তার দ্বারা তার ইলমের ওপর দলিল পেশ করা হতো না। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,**

﴿هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۖ...﴾ [يونس: 22]

(তিনিই তোমাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে ভ্রমণ করান) [ইউনুস: ২২] **অপর স্থানে তিনি বলেন, এবং তাতে ভ্রমণ করার ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম। (তোমাদেরকে বলা হয়েছিল) '**

﴿وَجَعَلۡنَا بَيۡنَهُمۡ وَبَيۡنَ ٱلۡقُرَى ٱلَّتِي بَٰرَكۡنَا فِيهَا قُرٗى ظَٰهِرَةٗ وَقَدَّرۡنَا فِيهَا ٱلسَّيۡرَۖ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ١٨﴾ [سبأ: 18]

তোমরা এসব জনপদে রাত-দিন (যখন ইচ্ছা) নিরাপদে ভ্রমণ কর।' [সাবা: ১৮] **তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, ভ্রমণ নির্ধারণ করা ও ভ্রমণ করানো তারই কর্ম এবং তার দ্বারাই ভ্রমণ সম্ভবপর হয়েছে।"** [১৮৫]

দ্বিতীয় দিকঃ বান্দাদের তাদের কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক।

মাতুরীদিয়্যাদের কথা যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের ভালো ও মন্দ কর্মের স্রষ্টা একেবারে সত্য কথা, যা প্রমাণ করে বর্ণিত ইলম ও বিবেক। আর তাই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত ও পূর্বসূরী উম্মতের কথা। তবে মাতুরীদিয়্যারা বান্দাদের সঙ্গে তাদের কর্মের সম্পর্ক বিষয়ে মুতাযিলাদের কথা ও জাবরিয়াদের কথার মাঝে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন। আর বলেছেন, বান্দাদের কর্মসমূহ আল্লাহর সৃষ্টি, তবে তা বান্দাদের থেকে উপার্জিত।

মাতুরীদী বলেনঃ "ওই কর্মের হাকিকত হলো, বান্দার জন্যে তা উপার্জনের ভিত্তিতে আর আল্লাহর জন্যে তা সৃষ্টির ভিত্তিতে।" [১৮৬]

আবূল মুয়ীন আন-নাসাফী বলেন: "আর আমাদের নিকট বান্দার কর্ম হলো আল্লাহ তা'আলার মাখলুক এবং তাঁরই কর্ম।আল্লাহ তা'আলা নিজেই তা সৃষ্টি করার দায়িত্ব নেন এবং তা অস্তিত্বহীনথেকে অস্তিত্বে নিয়ে আসেন আর বান্দা তা কামাই করে ও তার সঙ্গে জড়িত হয়।"[১৮৭]

আর কাসবের (উপার্জনের) অর্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য বিভিন্ন হয়েছে[১৮৮], তাদের বক্তব্যের সারাংশ হলো, আল্লাহ তা'আলার কুদরত মূল কর্মে প্রভাব সৃষ্টিকারী আর বান্দার কুদরত কর্মের বিশেষণে প্রভাব সৃষ্টিকারী। বস্তুত বান্দার এই প্রভাব হলো তাদের নিকট কাসব বা উপার্জন।

বায়াধি বলেন, "মূল কর্ম হলো আল্লাহর কুদরতের ফল, আর বান্দার কুদরতের ফলে তা ইবাদাত অথবা পাপ দ্বারা বিশেষিত হয়। এটাই হলো জমহুর মাতুরীদিয়্যাদের মাযহাব।" [১৮৯]

এর দ্বারা তারা উদ্দেশ্য করে যে, বান্দা তার কর্মের ইচ্ছা ও ইরাদা করা ছাড়া আল্লাহ তার কর্ম সৃষ্টি করেন না। এটি তারা স্পষ্ট বলেছে।

আবূল মুয়ীন আন-নাসাফী বলেন, "আর তিনি—অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা—তার ভেতর—অর্থাৎ বান্দার ভেতর—যা সৃষ্টি করেন তা বান্দার ইচ্ছার কারণেই সৃষ্টি করেন এবং তার ওপর বান্দার কুদরত রয়েছে। অতএব বান্দার কুদরতের সঙ্গে কর্মের সম্পর্কই তাকে তার কর্ম বানিয়েছে। সুতরাং বান্দার ইচ্ছার কারণে আল্লাহ তার কর্ম সৃষ্টিকারী, যদি বান্দার ইচ্ছা না হত এবং তা উপার্জন করার ইরাদা তার না হত, তাহলে কখনো আল্লাহ তার জন্যে কর্ম সৃষ্টি করতেন না।" [১৯০]

মাতুরীদিয়্যাদের এই কথার হাকিকত হলো, বান্দাদের ইচ্ছা রয়েছে যা আল্লাহর মাখলুক নয়,আর তা-ই হলো কর্মের শুরু (ভিত্তি)। তাদের মাযহাব মতে, বান্দাগণ পুরোপুরি স্বাধীনতাসহ যেভাবে চায় সেভাবে তাদের কর্মের শুরুতে কর্তৃত্ব করেন, আর আল্লাহ তা'আলা যে তাদের কর্ম সৃষ্টি করেন তা হলো তাদের ইচ্ছার অনুগামী যা মাখলুক নয়।

সন্দেহ নেই যে, মাতুরীদিয়্যাদের এই কথা বাতিল। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা "আল্লাহর পানাহ, আল্লাহ অনেক বড়, মহান ও সম্মানীত যে, তার বান্দার ভেতর এমন জিনিস থাকবে যা তার সৃষ্ট বস্তু নয় এবং তার কুদরত ও ইচ্ছার ভেতর নয়। বস্তুত যে এমন ধারনা করল সে আল্লাহকে যথাযথ সম্মান দিল না, এবং তাকে চেনার মত চিনল না এবং তাকে সম্মান করার মত সম্মান করল না, বরং বান্দার শরীর, রূহ, সিফাত, কর্ম, আবেগ-অনুভূতি এবং তার ভেতর প্রত্যেকটি অনু আল্লাহর এমন সৃষ্টি যার দ্বারা তার ভেতর তিনি কর্তৃত্ব করেছেন,... কাজেই সবদিক থেকে ও সব বিবেচনায় সে সৃষ্ট মাখলুক। তার মুখাপেক্ষিতা তার স্রষ্টা ও অস্তিত্ব দানকারীর প্রতি তার সত্তাগত আবশ্যক বিষয়। তার কালব তার স্রষ্টার হাতে এবং তার আঙ্গুলসমূহ হতে দুই আঙ্গুলের মাঝে, তিনি যেভাবে চান তাতে পরিবর্তন ঘটান, তিনি যা চান তার ইচ্ছায় তাকে বানিয়ে দেন আর বান্দা যা সংগঠিত হওয়া চায় না তা তার থেকে অনিচ্ছায় সংগঠিত হয়। কাজেই আল্লাহ যা চান তা হয় আর তিনি যা চান না তা হয় না..."[১৯১]

এর মানে এই নয় যে, বান্দা বাধ্য, তার কোনো ইচ্ছা নেই, বরং আল্লাহ তা'আলা তাকে জন্মগত এমন স্বভাব ও গুণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যার দ্বারা সে তার ইচ্ছা ও কর্ম তৈরি করতে পারে। আল্লাহর ইচ্ছা, ক্ষমতা ও সৃজন করার ফলেই জন্মগত স্বভাব সৃজিত হয়। এমন করে তিনিই তাকে সৃষ্টি করেছেন ও বানিয়েছেন। নিজের নফসকে সে এমন বানায়নি। বরং তার স্রষ্টা ও সৃজনকারী তাকে তার

ইচ্ছা ও কর্ম তৈরি করার ক্ষমতা দিয়েছেন। আর তারই ভিত্তিতে তাকে আদেশ ও নিষেধ করেছেন, তার ওপর হুজ্জত পূর্ণ করেছেন এবং তাকে সাওয়াব ও শাস্তির জন্যে পেশ করেছেন। অতএব সে যা করতে সক্ষম তার নির্দেশ তাকে দিয়েছেন এবং সে যা ছাড়তে সক্ষম তার থেকে তাকে নিষেধ করেছেন। আর তার সাওয়াব ও শাস্তি এসব কর্ম করা ও ছাড়ার ওপরই রেখেছেন, যার ওপর তাকে সক্ষম ও ক্ষমতাশীল করেছেন এবং যা তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। এবং তার সত্তাকে এসব কর্মে নিজের প্রশংসা ও নিন্দা করার ওপর সৃষ্টি করেছেন। মুমিন কাফির ও শরীয়ত স্বীকারকারী ও অস্বীকারকারী সবাই সমান। অতএব আল্লাহর চাওয়ার কারণে সে চাইতে পারে, যদি আল্লাহর ইচ্ছা তার না চাওয়ার বিষয়ে হত তাহলে সে চাইতে অক্ষম ও অপারগ হত। অতএব রব সুবহানাহু ওয়াতাআলা তাকে ইচ্ছা, ক্ষমতা ও ইরাদাহ দিয়েছেন এবং কীসে তাকে উপকার বা অপকার করবে তার পরিচয় দিয়েছেন। আর তাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন সে তার ইচ্ছা, ইরাদাহ ও কুদরত এমন রাস্তায় পরিচালনা করে যার দ্বারা সে নিজের সংশোধনের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে...” [১৯২]

আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمۡ أَن يَسۡتَقِيمَ ٢٨ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢٩﴾ [التكوير: 28-29]

তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায়, তার জন্য(২৮)। আর তোমরা ইচ্ছে করতে পার না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্ ইচ্ছে করেন (২৯)। [আত-তাকওয়ীর: ২৮-২৯]

অতএব বান্দাদের কর্ম হাকিকিভাবে তাদের কর্ম এবং সেটি রব তা‘আলার সৃষ্ট। কেননা কর্ম আর কৃত এক নয়। বান্দা হাকিকিভাবে তার কর্মটি করেছে আর আল্লাহ তার স্রষ্টা। বান্দা যে কুদরত ও ইচ্ছায়

কাজটি করেছে তার স্রষ্টাও তিনি এবং তার প্রেরণার স্রষ্টাও তিনি। মাসআলাটির রহস্য হলো, বান্দা কর্তা ও গ্রহিতা... আর রব নিজ কুদরত ও ইচ্ছাবলে তাকে কর্তা বানিয়েছেন এবং তাকে কর্ম করার ওপর সক্ষমতা দিয়েছেন এবং তার জন্যে ইচ্ছা সৃষ্টি করেছেন যা দিয়ে সে কাজ করে।" [১৯৩]

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ কুদরত (শক্তি) ও ইস্তেতাআত (সামর্থ):

আল-ইস্তিতাআহ (সামর্থ), আত-তাকাহ (ক্ষমতা), আল-কুদরাহ (কুদরত-শক্তি) ও আল-উসউ' (সক্ষমতা) কাছাকাছি অর্থের শব্দাবলী। তার বিপরীত হলো আল-আয (অক্ষমতা)। মুতাকাল্লিমগণ(দার্শনিকগণ) তার সংজ্ঞায় বলেছেন যে, তা হলো ইতিবাচক (অস্তিত্ববান) এমন বিশেষণ যার ফলে কর্ম ছাড়ার পরিবর্তে করা যায় আবার করার পরিবর্তে ছাড়া যায়।" [১৯৪]

ইস্তিতাআহ অথবা আল-কুদরার মাসআলাহ সেসব মাসআলার একটি যেখানে ইসলামী ফিরকাসমূহের মাঝে বিরোধ সংঘটিত হয়েছে তাকদীরে সংঘটিত বিরোধের অনুগামী হিসেবে। কাজেই যারা আল-জাবর (বাধ্যতা) বলেন, অর্থাৎ জাবরিয়াহ ও তাদের মতাদর্শীগণ, তারা ইস্তিতাআতকে অস্বীকার করেন কর্মের সঙ্গে হোক বা তার পূর্বে হোক। কেননা তাদের নিকট বান্দার কোনো ইচ্ছা নেই। [১৯৫]

আর যারা বলেছে যে, তাকদীর বলতে কিছু নেই, বান্দাই তার কর্মের স্রষ্টা—তারা হলো মুতাযিলা ও তাদের মতাদর্শীগণ—তারা কর্মের পূর্বে ইস্তিতাআতকে সাব্যস্ত করেছেন, তবে তার সঙ্গে হওয়াকে অস্বীকার করেছেন[১৯৬]

আর যারা কাসব (উপার্জন) বলেন,—তারা হলেন আশায়েরাহ ও তাদের মতাদর্শীগণ—তারা বলেন, ইস্তিতাআত হয় কর্মের সঙ্গে তার পূর্বে নয়[১৯৭]

পক্ষান্তরে জমহুর মাতুরীদিয়্যাগণ মাসআলাটিতে মধ্যপন্থা গ্রহণ করেছেন। তারা কর্মের পূর্বে ও তার সঙ্গে ইস্তিতাআত স্বীকার করেন। তারা বলেন, ইস্তিতাআত দুই প্রকার হয়:

প্রথমত: উপায় ও উপকরণসমূহের নিরাপদ হওয়া আর তা কর্মের পূর্বে হয়।

দ্বিতীয়ত: সামর্থ হওয়া যার দ্বারা কর্ম প্রস্তুত হয় আর তা কর্মের সঙ্গে হয়।

মাতুরিদী বলেনঃ "আমাদের নিকট কুদরত বিশেষ্যটি দু'প্রকার: প্রথমটি হলো: উপায় ও উপকরণ নিরাপদ হওয়া আর তা কর্মের পূর্বে হয়।

দ্বিতীয়টি হলো: অর্থগত, তার সংজ্ঞা এমন কোনো বস্তু দ্বারা বর্ণনা করা সম্ভবপর নয় যার দিকে তাকে ফিরানো যায়, তবে এতটুকু বলা ছাড়া যে, তা কেবল কর্মের জন্যেই হয়, কোনো অবস্থাই তা পাওয়া যাওয়া বৈধ নয়, তবে তার দ্বারা কর্ম সংঘটিত হয় যখন সে কর্মের সঙ্গী হয়।"[১৯৮]

আবুল মুয়ীন আন-নাসাফী বলেন, "অতঃপর আল-ইস্তিতাআহ (যোগ্যতা), আত-তাকাহ (ক্ষমতা), আল-কুদরাহ (সামর্থ), আল-কুউওয়াহ (শক্তি) যখন বান্দার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয় তখন তার সবগুলো দ্বারা একটি অর্থ উদ্দেশ্য হয় উসূলীদের পরিভাষায়।

অতঃপর আমাদের নিকট ইস্তিতাআত দু'প্রকার:

একটি হলো: উপায় ও উপকরণ নিরাপদ হওয়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূ্ের সুস্থ থাকা। আর এটিই হলো আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের বাণীতে উদ্দেশ্য:

﴿...وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧﴾ [آل عمران: 97]

(এবং সামর্থ্যবান মানুষের ওপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ করা ফরয)। [আলে ইমরান : 97] এবং তাঁর বাণী:

﴿... فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ ....﴾ [المجادلة: 4]

(আর যে (এরূপ করার) সামর্থ্য রাখে না সে ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে) [আল-মুজাদালাহ:৪] এবং তাঁর বাণী, যেখানে তিনি মুনাফিকদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে বলেছেনঃ

﴿...لَوِ ٱسۡتَطَعۡنَا لَخَرَجۡنَا مَعَكُمۡ يُهۡلِكُونَ أَنفُسَهُمۡ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ إِنَّهُمۡ لَكَٰذِبُونَ ٤٢﴾ [التوبة: 42]

(‘যদি আমরা সক্ষম হতাম তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম, তারা তাদের নিজেদেরকেই ধ্বংস করে। আর আল্লাহ জানেন, নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।) [আত-তাওবাহ: ৪২] অর্থাৎ যদি আমাদের জন্যে উপায় ও উপকরণসমূহ থাকত (তাহলে আমরা তোমাদের সঙ্গে বের হতাম)। কারণ, এই সামর্থ্যের ওপর তাকলীফের (শরীয়তের নির্দেশের) বিশুদ্ধতা নির্ভরশীল। দ্বিতীয়টি হলো: এমন সামর্থ্য যা কুদরতের হাকিকত এবং যার দ্বারা কর্ম তৈরি হয়। আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের বাণীতে তাই উদ্দেশ্য:

﴿... وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنۡ أَوۡلِيَآءَۘ يُضَٰعَفُ لَهُمُ ٱلۡعَذَابُۚ مَا كَانُواْ يَسۡتَطِيعُونَ ٱلسَّمۡعَ وَمَا كَانُواْ يُبۡصِرُونَ ٢٠﴾ [هود: 20]

আর আল্লাহ্ ছাড়া তাদের অন্য কোনো সাহায্যকারী ছিল না; তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে; তাদের শুনার সামর্থ্যও ছিল না এবং তারা দেখতেও পেত না। [হুদ: ২০] **তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ তা'আলা আয়াত দ্বারা তাদের বদনাম করেছেন। আর বদনাম তখনই তাদেরকে স্পর্শ করবে যখন উপকরণ সঠিক ও উপায়সমূহ নিরাপদ থাকার পরও সত্যিকার কুদরত না থাকবে; উপকরণ সঠিক না থাকা ও উপায়সমূহ নিরাপদ না হওয়ার কারণে নয়। কেননা ওই সক্ষমতা না থাকা তার নষ্ট করার ফলে হয় না, বরং সে তাতে বাধ্য। কাজেই তা না থাকার সময় কর্ম থেকে বিরত থাকার ফলে তাদেরকে বদনাম স্পর্শ করেনি। অনুরূপ নিম্নে মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গীর (খাদিরের) কথার উদ্দেশ্যও তাই।**

﴿قَالَ إِنَّكَ لَن تَسۡتَطِيعَ مَعِيَ صَبۡرٗا ٦٧﴾ [الكهف: 67]

(সে বলল, আপনি কিছুতেই আমার সংগে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবেন না) [আল-কাহাফ:৬৭] **এবং তার বাণী**

﴿۞ قَالَ أَلَمۡ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسۡتَطِيعَ مَعِيَ صَبۡرٗا ٧٥﴾ [الكهف: 75]

(সে বলল, 'আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সংগে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না?) [আল-কাহাফ:৭৫] **কেননা যদি ইস্তিতাআত দ্বারা উদ্দেশ্য হত উপকরণ ও উপায়সমূহের সঠিক থাকা, তাহলে কখনো তাকে সবর ত্যাগ করার ওপর তিরস্কার করতেন না।**

দ্বিতীয় ইস্তিতাআত, আমাদের নিকট এমন এক বিশেষণ যা কর্মের সঙ্গে অস্তিত্বে আসে..." [১৯৯]

ইস্তিতাআতের ক্ষেত্রে জমহুর মাতুরিদিদের কথাই হলো আহলূস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের কথা[২০০], আর তাই হলো সত্য কথা যার ওপর প্রমাণ রয়েছে।

তাহাভী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: "ইস্তিতাআত, যার ফলে কর্ম ওয়াজিব হয়, তা তাওফিকের মতই, যার দ্বারা মাখলুককে বিশেষিত করা বৈধ নয় তা কর্মের সঙ্গে হয়। আর ইস্তিতাআত, যেমন সুস্থতা, সামর্থ, সক্ষমতা ও উপায়সমূহের নিরাপদ হওয়া তা কর্মের পূর্বে হয় এবং তার সঙ্গেই সম্বোধন সম্পৃক্ত হয়।" ইবনুল ইজ্জ রাহিমাহুল্লাহ তাহাভীর কথা স্পষ্ট করে বলেন, "অধিকাংশ আহলুস সুন্নাহ বলেন যে, বান্দার একটি কুদরত (সামর্থ) রয়েছে, তাই হলো আদেশ ও নিষেধের ভিত্তি। এটি কখনো তার পূর্বে হয় তার সঙ্গে হওয়া ওয়াজিব নয়। আর যেই কুদরতের সঙ্গে কর্ম হয় সেটির অবশ্যই কর্মের সঙ্গে হওয়া ওয়াজিব। কেননা অস্তিত্বহীন কুদরত দ্বারা কর্ম পাওয়া যাওয়া বৈধ নয়। আর যেই কুদরত সুস্থতা, সক্ষমতা, সামর্থ ও উপায়সমূহের নিরাপদ হওয়ার নাম, সেটি কর্মের পূর্বে হয়। আর এই কুদরত উল্লিখিত রয়েছে আল্লাহ তা'আলার বাণীতে:

﴿فِيهِ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧﴾ [آل عمران: 97]

"এবং সামর্থ্যবান মানুষের উপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ্জ করা ফরয। আর যে কুফরী করে, তবে আল্লাহ তো নিশ্চয় সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী।" [আলে ইমরান : 97] অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ ....﴾ [التغابن: 16]

"অতএব, তোমরা যথাসম্ভব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর।" [আত-তাগাবুন : ১৬] অনুরূপ আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿... فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ ...﴾ [المجادلة: 4]

(আর যে (এরূপ করার) সামর্থ্য রাখে না সে ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে) [আল-মুজাদালাহ:৪] তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উপায় ও উপকরণসমূহের সামর্থ... আর ইস্তিতাআত সাব্যস্ত হওয়ার দলিল, যা হলো কুদরতের হাকিকত। তাতে তারা আল্লাহর নিম্মের বাণীকে উল্লেখ করেছেন:

﴿... مَا كَانُواْ يَسۡتَطِيعُونَ ٱلسَّمۡعَ وَمَا كَانُواْ يُبۡصِرُونَ ۝٢٠﴾ [هود: 20]

(তাদের শুনার সামর্থ্যও ছিল না এবং তারা দেখতেও পেত না।) [হুদ: ২০] উদ্দেশ্য হলো কুদরতের হাকিকত না করা উপায় ও উপকরণসমূহ না করা নয়..." [২০১]

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ সামর্থ নেই এমন জিনিসের দায়িত্ব প্রদান করা।

সামর্থ নেই এমন বস্তুর দায়িত্ব প্রদান করা বিষয়টিও সেসব বিষয়ের একটি যেখানে মুসলিম জামাতসমূহের মাঝে মত বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। আর এটিও ইস্তিতাআহ, তাহসীন ও তাকবীহের মাঝে সৃষ্ট মত বিরোধের ফল। জাহমিয়ারা সামর্থ নেই এমন বস্তুর দায়িত্ব প্রদানকে বিনা শর্তে বৈধ বলেন। [২০২]

আর মুতাযিলারা বলেন, সামর্থ নেই এমন জিনিসের দায়িত্ব প্রদান করা বৈধ নেই। কারণ সেটি খারাপ। আল্লাহ তা'আলা খারাপ কর্ম থেকে পবিত্র। কাজেই তার থেকে তা প্রকাশ পাওয়া বৈধ নয়[২০৩]।

আশায়েরাগণ সামর্থ্যের বাইরের বিষয়ে দায়িত্ব প্রদানকে বৈধ বলেন, যদিও সেটি শরীয়তে সংঘটিত হয়নি। এটিকে তারা বিবেকের দৃষ্টিতে অনুমোদন করেছেন তাদের বিবেকি ভালো ও মন্দ না করার নীতির ওপর। [২০৪]

আর এই মাসআলায় মাতুরীদিয়্যারা মুতাযিলাদের সঙ্গে একমত হয়েছেন। তারা সামর্থ নেই এমন জিনিসের দায়িত্ব প্রদান করা বৈধ নয় বলেন। কেননা তা বিবেকের দৃষ্টিতে বাতিল এবং কুদরত না থাকাও কারণ, যা তাকলীফের দাবি।

মাতুরিদী বলেন, "মূল নীতি হলো, যার থেকে শক্তিকে রহিত করা হয়েছে বিবেকের দৃষ্টিতে তাকে দায়িত্ব প্রদান করা বাতিল।" [২০৫]

ইবনুল হুমাম বলেন, "তাদের থেকে (অর্থাৎ মাতুরীদিয়্যাদের থেকে) এমন কাউকে জানি না যিনি সামর্থ নেই এমন জিনিসের দায়িত্ব প্রদান করাকে বৈধ বলেছেন।" [২০৬]

মাসআলাটি ব্যাখ্যা করে বলাই হলো সঠিক। অতএব বলা হবে, সামর্থ নেই এমন জিনিসের দায়িত্ব প্রদান করা দু'ভাগে ভাগ হয়:

একটি হলো: অক্ষমতার কারণে সামর্থ না থাকা। দীর্ঘকাল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে চলার দায়িত্ব প্রদান করা এবং মানুষকে উড়ার দায়িত্ব প্রদান করা প্রভৃতি। তাকদীর সাব্যস্তকারী জমহুর আহলুস সুন্নাহের নিকট এটি শরীয়তে সংঘটিত হয়নি।

দ্বিতীয়টি হলো: কোনো কিছুর বিপরীত বস্তুতে লিপ্ত থাকার কারণে তার সামর্থ না থাকা। যেমন কাফিরের কুফরিতে লিপ্ত থাকা। কারণ, এটিই তাকে ঈমান থেকে বিরত রেখেছে এবং যেমন বসা ব্যক্তির তার বসাবস্থায় থাকা, কেননা বসে থাকার ব্যস্ততা তাকে দাঁড়ানো থেকে বিরত রেখেছে। আবার দুই বিপরীত বস্তু থেকে একটির চূড়ান্ত ইচ্ছা

অপরটির ইচ্ছা করাকে নিষেধ করে। কাফিরকে ঈমানের দায়িত্ব প্রদান করা এই জাতীয় বিষয়।

এরূপ বিষয় কোনো বিবেকির নিকট বিবেকের দৃষ্টিতে খারাপ নয়। বরং বিবেকিগণ মানুষকে এমন জিনিসের আদেশ ও নিষেধ করার ব্যাপারে একমত আদেশ ও নিষেধের সময় যার ওপর সে সামর্থবান নয় তার বিপরীত বস্তুতে ব্যস্ত থাকার কারণে, যখন সম্ভব হবে বিপরীত বস্তু ছেড়ে দিয়ে আদিষ্ট বিপরীত বস্তুটি বাস্তবায়ন করবে।

এটি সামর্থ নেই এমন বস্তুর ভেতর দাখিল হয় না, কেননা হজের আদেশপ্রাপ্ত সক্ষম ব্যক্তি যখন হজ করল না তখন তাকে বলা হয় না যে, তাকে সামর্থের বাইরের জিনিসের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে তার ক্ষেত্রেও সামর্থ নেই এমন জিনিসের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে বলা হয় না, যাকে পবিত্রতা ও সালাতের নির্দেশ দেয়া হল, কিন্তু অলসতা করে সে তা ছেড়ে দিল" [২০৭]

চতুর্থ অধ্যায়: ঈমানের মাসআলাসমূহ:

এতে পাঁচটি পরিচ্ছেদ রয়েছেঃ

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ঈমানের অর্থ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ঈমানের বৃদ্ধি ও হ্রাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ঈমানের ক্ষেত্রে ইস্তেসনা করা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ ঈমানে ও ইসলামের মাঝে সম্পর্ক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ কবিরাহ গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির হুকুম।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ঈমানের অর্থ ও তার হাকিকত।

মাতুরীদিয়্যারা গ্রহণ করেছেন যে, ঈমান হলো শুধু অন্তরের বিশ্বাস। আর তাদের কেউ গ্রহণ করেছেন যে, ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকৃতি। [২০৮]

আবূল মুয়ীন আন-নাসাফী বলেনঃ "অভিধানে ঈমান হলো সত্যায়ন ও বিশ্বাস করার নাম। অতএব প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে অপরকে বিশ্বাস করল সে যা সংবাদ দেয় তাতে অভিধানে তাকে তার প্রতি বিশ্বাসী ও তাকে বিশ্বাসকারী বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿... أَنتَ بِمُؤۡمِنٖ لَّنَا ...﴾ [يوسف: 17]

(আর আপনি আমাদের প্রতি বিশ্বাসী নন) [ইউসুফ: ১৭] অর্থাৎ আপনি আমাদেরকে সত্যারোপকারী নন। অতঃপর আভিধানিকগণ

বলেন, ঈমান হলো অন্তরের সত্যায়ন ও বিশ্বাস করা। তাই হলো বান্দার ওপর আল্লাহর হক হিসেবে ওয়াজিব হওয়া ঈমানের হাকিকত। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় রবের পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তাতে তাকে বিশ্বাস করা। যে এই বিশ্বাস করল সে তার মাঝে ও আল্লাহ তা'আলার মাঝে বিশ্বাসী মুমিন হলো[২০৯]।

এই কথা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের কথার বিপরীত। কেননা أَمِنَ মূল ধাতুর আভিধানিক অর্থ, আস্থাশীল হলো ও নিরাপদ হল। আর আমানাত হলো বিশস্বস্ততা (বন্ধন)[২১০]। বলা হয়: "আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে আমি তার মালিককে খুঁজে পাব অর্থাৎ আমি আস্থাশীল ছিলাম না।[২১১]

রাগিব আল-আসবাহানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "الأمن এর মূল হলো নফসের স্বস্তি ও ভয় দূর হওয়া।"[২১২]

الإيمان হলো آمن يؤمن إيماناً فهو مؤمن এর ধাতু (মাসদার)[২১৩], আর آمن এর মূল হলো أأمن দু'টি হামযাসহ। দ্বিতীয় হামযাটি লীন করা হয়েছে[২১৪], আর তা হলো الأمن (নিরাপত্তা), যা الخوف (ভয়)এর বিপরীত[২১৫]।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহেমাহুল্লাহ ঈমানের সংজ্ঞায় বলেনঃ "...তার উৎপত্তি হলো الأمن থেকে, যার অর্থ স্বীকৃতি প্রদান করা ও প্রশান্তি লাভ। আর এটি তখন হাসিল হয়, যখন অন্তরে বিশ্বাস ও আনুগত্য স্থির হয়।[২১৬]

আর এই স্বীকৃতিই শামিল করে অন্তরের কথাকে যার নাম হলো তাসদীক (বিশ্বাস) আর অন্তরের আমলকে যার নাম হলো ইনকিয়াদ (বশ্যতা)।

আর ঈমানের অর্থ হলো: বশ্যতাসহ সত্যায়ন ও বিশ্বাস করা। এটি কখনো ব্যবহৃত হয় "বা" হরফ দ্বারা আবার কখনো ব্যবহৃত হয় "লাম" হরফ দ্বারা। "বা" হরফ দ্বারা ব্যবহৃত হলে এভাবে বলা হয় যে, آمن به قوم وكذّب به قومٌ এক কওম তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে [২১৭] আর অপর কওম তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। এ অর্থেই আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ ...﴾ [البقرة: 3]

(যারা গায়েবের প্রতি ঈমান আনে) [আল-বাকারাহ: ৩] অর্থাৎ তারা জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে আল্লাহর সংবাদকে বিশ্বাস করেন [২১৮]।

আর দ্বিতীয়টির অর্থ, অর্থাৎ "লাম" হরফ দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার অর্থ। আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদের সম্পর্কে বলেন, তারা বলেছে:

﴿وَلَا تُؤۡمِنُوٓاْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمۡ ...﴾ [آل عمران: 73]

(আর তোমরা কেবল তাদেরকে বিশ্বাস কর, যারা তোমাদের দীনের অনুসরণ করে।) [আলু ইমরান : 73] অর্থাৎ তোমরা স্বীকার কর না ও বিশ্বাস কর না[২১৯]

অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿... وَمَآ أَنتَ بِمُؤۡمِنٖ لَّنَا ...﴾ [يوسف: 17]

(আর আপনি আমাদেরকে বিশ্বাসকারী নন) [ইউসুফ: ১৭] অর্থাৎ আমাদেরকে সত্যারোপকারী নন [২২০]

উভয়ের মাঝে তফাৎ হলো, "বা" হরফ দ্বারা ব্যবহৃত হলে তার অর্থ হয় প্রদানকৃত সংবাদকে বিশ্বাস করা আর "লাম" হরফ দ্বারা ব্যবহৃত হলে তার অর্থ হয় সংবাদ প্রদানকারীকে বিশ্বাস করা[২২১]

কাজেই ঈমান হলোঃ মুখে স্বীকার করা, অন্তরে বিশ্বাস করা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল করা, যা রহমানকে আনুগত্য করার ফলে বর্ধিত হয় আর যা শয়তানকে আনুগত্য করার ফলে হ্রাস পায়[২২২]

ইমাম শাফী' রাহিমাহুল্লাহ বলেছেনঃ "সাহাবা ও তাঁদের পরবর্তী তাবেঈদের থেকে যাদেরকে আমরা পেয়েছি তাদের সবার ঐকমত্য হলো: ঈমান হলো কথা, কর্ম ও নিয়ত। এই তিনটির কোনো একটি অপর ছাড়া যথেষ্ট নয়।"[২২৩]

"আসল কথা হলো, অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকারুক্তি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল করাই হলো ঈমান। আর কেউ মুমিন হবে না যতক্ষণ না তার ভেতর এই তিনটি স্বভাব জমা হবে।" অধ্যায়ে মুহাম্মাদ ইবন হুসাইন আজুররী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তোমরা জেনে রেখো যে, (আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের ওপর রহম করুন) মুসলিমদের আলিমগণ যে কথার ওপর রয়েছে তা হলো সকল মাখলুকের ওপর ঈমান ওয়াজিব। আর তা হলো অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল করা।

অতঃপর জেনে রেখো যে, মুখে স্বীকার করার ঈমান ছাড়া কেবল অন্তরে জানা ও বিশ্বাস করাই যথেষ্ট হবে না। আর অঙ্গসমূহ দ্বারা আমল করা ছাড়া কেবল অন্তরে জানা ও মুখে স্বীকার করা যথেষ্ট হবে না। যখন কোনো ব্যক্তির ভেতর এই তিনটি স্বভাব পূর্ণ হবে তখনই সে মুমিন হবে। কুরআন, সুন্নাহ ও মুসলিম আলেমদের বাণীসমূহ তার ওপরই প্রমাণ বহন করে..." [২২৪]

ঈমানের সংজ্ঞায় এসব বিষয় দাখিল হওয়ার অনেক দলিল রয়েছে, যেমন তার ভেতর অন্তরের বিশ্বাস ও তার ইয়াকিন দাখিল হওয়ার দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدۡقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ ٣٣ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمۡۚ ذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٣٤﴾ [الزمر: 33-34]

"আর যে সত্য নিয়ে এসেছে এবং যে তা সত্য বলে মেনেছে তারাই তো মুত্তাকী।" (৩৩) তাদের জন্য তা-ই থাকবে যা চাইবে তারা তাদের রবের নিকট। এটাই সৎকর্মশীলদের পুরস্কার। (৩৪) [আয-যুমার: ৩৩-৩৪] **আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর এভাবেই আমরা ইবরাহীমকে আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব দেখাই এবং যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর শাফায়াতের হাদীসে রয়েছে: (যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলেছে এবং তার অন্তরে জবের ওজন পরিমাণ কল্যাণ রয়েছে তাকেই জাহান্নাম থেকে বের করা হবে)[২২৫]**

আল্লাহ তা'আলা তার বাণীতে অন্তেরর কতক আমল উল্লেখ করেছেন, যেমন ইখলাস, মুহাব্বাত, ইনকিয়াদ (আনুগত্য), আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করা, তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল করা এবং তার আবশ্যিক ও অনুগামী বিষয়সমূহ।আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَا تَطۡرُدِ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجۡهَهُۥۖ ....﴾ [الأنعام: 52]

আর তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না তাদেরকে, যারা নিজ রবকে সকাল সন্ধ্যায় ডাকে, তারা তার সন্তুষ্টি চায়। [আল-আনআম:দ ৫২] **এবং তিনি বলেনঃ**

﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُۥ مِن نِّعۡمَةٖ تُجۡزَىٰٓ ١٩ إِلَّا ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِ ٱلۡأَعۡلَىٰ ٢٠﴾ [الليل: 19-20]

এবং তার প্রতি কারও এমন কোনো অনুগ্রহ নেই যার প্রতিদান দিতে হবে(১৯), শুধু তার মহান রবের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় (২০); [আল-লায়ল: ১৯-২০] **আরো অনেক নস প্রমাণ করে যে, তাওয়াক্কুল, ভয়, আশা, ডর, আনুগত্য, মনোনিবেশ করা প্রভৃতি অন্তরের আমল। তন্মধ্যে**

শাহাদাতাইন (দু'টি সাক্ষ্য) উচ্চারণ করা, অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তার আবশ্যিক বিষয়গুলো স্বীকার করা মর্মে আল্লাহ তা'আলার বাণী। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ١٣٦﴾ [البقرة: 136]

"তোমরা বল, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের উপর ও যা নাযিল করা হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাদের সন্তানদের উপর আর যা প্রদান করা হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং যা প্রদান করা হয়েছে তাদের রবের পক্ষ হতে নবীগণকে। আমরা তাদের কারো মধ্যে তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরই অনুগত'। [আল বাকারাহ: ১৩৬] আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَإِذَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّنَآ ...﴾ [القصص: 53]

(আর যখন তাদের নিকট তা তিলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, নিশ্চয় তা সত্য আমাদের রবের পক্ষ থেকে) [আল-কাসাস:৫৩] আর (রাসূলুল্লাহ্) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (আমি মানুষদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাবূদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল) [২২৬]

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ ٢٩﴾ [فاطر: 29]

তন্মধ্যে আল্লাহর বাণী এমন আমল মর্মে যা জবান দ্বারা আদায় করা হয়, যেমন কুরআন তিলাওয়াত করা ও সকল যিকর যথা তাসবীহ, তাহমীদ, তাকবীর, দো'আ, ইস্তেগফার প্রভৃতি: নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং সালাত কায়েম করে, আর আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করে এমন ব্যবসায়ের, যার ক্ষয় নেই। [ফাতির:২৯] **এবং তিনি বলেনঃ**

﴿وَٱتۡلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيۡكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦ ...﴾ [الكهف: 27]

(আর তোমার রবের কিতাব থেকে তোমার নিকট যা ওহী পাঠানো হয়, তুমি তা তিলাওয়াত কর। তাঁর বাণীসমূহের কোনো পরিবর্তনকারী নেই। [আল-কাহাফ: ২৭] **এবং তিনি বলেনঃ**

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكۡرٗا كَثِيرٗا ۝٤١ وَسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا ۝٤٢﴾ [الأحزاب: 41-42]

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ কর(৪১), এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর(৪২)। [আল-আহযাব: ৪১-৪২] **তন্মধ্যে আল্লাহর বাণী এমন আমল মর্মে যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর তা হলো এমন আমল যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাড়া আদায় করা যায় না, যেমন কিয়াম, রুকু, সুজুদ, মসজিদে চলা, হজে যাওয়াা ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ**

﴿...وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ...﴾ [البقرة: 233]

আর আল্লাহর জন্যে দাঁড়াও বিনীত হয়ে। [আল-বাকারাহ : ২৩৮] **আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ**

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْۤ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ۩ ٧٧ وَجَـٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ ....﴾ [الحج: 77-78]

হে মুমিনগণ! তোমরা রুকূ' কর, সিজদা কর এবং একমাত্র তোমাদের রব-এর 'ইবাদত কর ও সৎকাজ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (৭৭) (আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিৎ) [আল-হাজ্জ: ৭৭-৭৮] **আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ**

﴿وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَـٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَـٰمٗا ٦٣ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمۡ سُجَّدٗا وَقِيَـٰمٗا ٦٤﴾ [الفرقان: 63-64]

আর রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা বলে 'সালাম'(৬৩)। এবং তারা রাত অতিবাহিত করে তাদের রব-এর উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে থেকে;(৬৪) [আল-ফুরকান: ৬৩-৬৪] [২২৭]

তার মর্মে স্পষ্ট আরো দলিল হলো, আব্দুল কায়েসের প্রতিনিধির হাদীস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে বলেন, (আমি তোমাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের নির্দেশ দিচ্ছি), এবং তিনি বলেনঃ (তোমরা কী জান যে, এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন কী)? তারা বলল, আল্লাহ এবং তার রাসূল ভালো জানেন। তিনি বললেন, (আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাবূদ নেই এর সাক্ষ্য প্রদান করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা ও গণিমত থেকে এক পঞ্চমাংশ দান করা) [২২৮]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ঈমানের বৃদ্ধি ও হ্রাস।

এই মাসআলা তার পূর্বের মাসআলার ওপর নির্ভরশীল। কেননা মাতুরীদিয়্যারা যখন বলল যে, ঈমান হলো তাসদীক (বিশ্বাস) এর নাম এবং আমল তার অন্তর্ভুক্ত নয় তখন তারা ঈমানের হ্রাস ও বৃদ্ধি নেই বলল। আর তার ওপর নীতি তৈরি করল যে, বিশ্বাসের ভেতর হ্রাস ও বৃদ্ধি কল্পনা করা যায় না।

হাকীম সামারকান্দি বলেনঃ "জানা আবশ্যক যে, ঈমান বাড়ে না আবার হ্রাসও পায় না। কেননা যে ঈমানের ভেতর হ্রাস ও বৃদ্ধি দেখেন সে বিদআতি। হ্রাস ও বৃদ্ধি কেবল কর্মের ভেতর হয় ঈমানের ভেতর নয়। কোনো আলেম ও নেককার ঈমান বাড়ে ও কমে এই কথা বলেননি" [২২৯]

আবূল মুয়ীন আন-নাসাফী বলেনঃ "যখন প্রমাণিত হল যে, ঈমান হলো তাসদীক আর তার ভেতর বৃদ্ধি নেই।তখন প্রমাণিত হল যে, ঈমান বাড়ে না, হ্রাসও পায় না। কাজেই তার সঙ্গে ইবাদত মিলিত হলে তাতে বৃদ্ধি ঘটে না এবং পাপ সংঘটিত হলে তার হ্রাসও হয় না। কারণ, উভয় অবস্থায় তাসদীক (বিশ্বাস) তার পূর্বের অবস্থায় বহাল।"[২৩০]

এই কথা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত যে বলেন, ঈমান ইবাদতের ফলে বাড়ে আর পাপের ফলে হ্রাস পায় তার বিপরীত।[২৩১] বস্তুত ঈমানের হ্রাস ও বৃদ্ধির ওপর কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফদের অনেক বাণী রয়েছে।

তন্মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿...وَإِذَا تُلِيَتۡ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنٗا ...﴾ [الأنفال: 2]

(আর যখন তাদের ওপর তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে।) [আল-আনফাল: ২] আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

﴿وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوۡاْ هُدٗىۗ ....﴾ [مريم: 76]

(আর যারা সঠিক পথে চলে আল্লাহ তাদের হিদায়েত বৃদ্ধি করেন) [মারয়াম: ৭৬] আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿... وَيَزۡدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَٰنٗا ...﴾ [المدثر: 31]

(আর মুমিনদের ঈমান বেড়ে যায়) [আল-মুদ্দাসসির: ৩১] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ لِيَزۡدَادُوٓاْ إِيمَٰنٗا ...﴾ [الفتح: 4]

"তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেছিলেন যেন তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বৃদ্ধি পায়।" [আল-ফাতহ:৪] আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদেরকে বিবেক ও দীনের কমতি দ্বারা বিশেষিত করেছেন। তিনি বলেনঃ (... আর জ্ঞানীদের উপর প্রভাব বিস্তারকারী দীন ও জ্ঞানে ত্রুটিপূর্ণ তোমাদের চাইতে কাউকে দেখিনি) [২৩২]

আর শাফায়াতের হাদীসে রয়েছে: যাও, যার অন্তরে সরিষার দানার চেয়েও অতি ক্ষুদ্র পরিমাণও ঈমান আছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আন। ফলে আমি তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনব। [২৩৩]

এই অর্থে সাহাবী ও তাদের পরবর্তীদের অনেক কথা রয়েছে। আবুদ দারদা বলেনঃ "বান্দার বুত্তিমত্তার পরিচয় হলো তার ঈমানকে ও তার থেকে কতটুকু হ্রাস পেল তা পরখ করা। বান্দার আরো বুদ্ধির পরিচয় হলো, তার ঈমান বাড়ছে না কমছে জানা?" [২৩৪] ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু দোয়ার সময় বলতেনঃ "হে আল্লাহ, আমাদের ঈমান, ইয়াকীন ও ফিকহ বাড়িয়ে দিন।"[২৩৫]

শাফী' রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ "ঈমান হলো কথা ও আমলের সমষ্টি, ইবাদতের দ্বারা বাড়ে ও পাপের দ্বারা কমে।"[২৩৬] বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ "আমি বিভিন্ন শহরে এক হাজারের বেশী আলেমের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি, তাদের কাউকে দেখেনি যে, "ঈমান হলো কথা ও আমলের সমষ্টি, বাড়ে ও কমে" মাসআলায় দ্বিমত পোষণ করেছেন।" [২৩৭]

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ঈমানের ক্ষেত্রে ইস্তেসনা করা।

ঈমানের ক্ষেত্রে ইস্তিসনা করার উদ্দেশ্য হলো, ঈমানকে আল্লাহর ইচ্ছার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা। অর্থাৎ কোনো মুমিনের বলা: আমি মুমিন ইনশাআল্লাহ।

মাতুরীদিয়্যারা যখন বলল যে, ঈমান হলো তাসদীক (বিশ্বাস করা) এবং তা বৃদ্ধি ও হ্রাসকে গ্রহণ করে না, তখন তারা ঈমানের ক্ষেত্রে ইস্তিসনাকে নিষেধ করল। আর বলল যে, ইস্তিসনা হলো সন্দেহ আর যে তার বিশ্বাসে সন্দেহ করল সে কাফির।

আবূল মানসুর মাতুরিদী বলেনঃ "আমাদের নিকট মূল নীতি হলো, ঈমানের বিষয়ে নিশ্চিত কথা বলা এবং তার দ্বারা বিনা শর্তে নামকরণ করা আর তাতে ইস্তিসনা পরিহার করা। কেননা ব্যক্তির ভেতর যেসব বিশেষণ জমা হলে তার ঈমান পূর্ণ হয়, ইস্তিসনা করা হলে তার ভেতর সেসব বিশেষণ জমা হওয়ার কথাটি বিশুদ্ধ হয় না। কাজেই তার ভিত্তিতে এ কথা বলা ঠিক নয় যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল ইনশা আল্লাহ। অনুরূপভাবে পুনরুত্থান,ফেরেশ্তা, রাসূলগণ ও কিতামসমূহের সাক্ষী।" [২৩৮]

আবূল মুয়ীন আন-নাসাফী বলেনঃ “অতঃপর যখন তাসদীকের নাম ঈমান হলো। আর তা হলো একটি হাকিকি বস্তু যার সংজ্ঞা পরিচিত। যখন এই সংজ্ঞা হাসিল হবে তখন তার দ্বারা সত্ত্বা মুমিন হবে, যেমন দাড়ানো থেকে বসা, শোয়া থেকে বসা, কালো, সাদা প্রভৃতি এমন অর্থ যার সংজ্ঞা পরিচিত। কাজেই যখন তা হাকিকতসহ পাওয়া যাবে তখন সত্ত্বাও তার সঙ্গে বসে থাকবে, কালো ও সাদা হবে প্রভৃতি। এভাবে।

আর এটি জানার দ্বারা জানা যায় যে, যখন তাসদীক পাওয়া গেল তখন ঈমানও হাকিকতসহ পাওয়া গেল। অতএব তাসদীকের হাকিকত পাওয়া যাওয়া সত্ত্বে যে বলল, (আমি মুমিন ইনশাআল্লাহ), তার কথা ওই ব্যক্তির কথার মত হলো, যে দাঁড়ানো ও বসার হাকিকত পাওয়া যাওয়া সত্ত্বে বলল, (আমি দাঁড়ানো ইনশাআল্লাহ), (আমি বসা ইনশাআল্লাহ)। আর তা বাতিল। অনুরূপ এটিও।[২৩৯]

অতএব মাতুরীদিয়্যারা ঈমানের ভেতর ইস্তিসনাকে নিষেধ করেছেন। কারণ, ঈমানের হাকিকত ও অর্থ হলো (শুধু) তাসদীক অথবা তাসদীক ও কথা।

ঈমানের ভেতর ইস্তিসনা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঈমানকে (আল্লাহর) ইচ্ছার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা। অর্থাৎ কোনো মুমিনের (আমি মুমিন ইনশাআল্লাহ) বলা। বস্তুত এই মাসআলায় ইখতিলাফ হয়েছে ঈমানের হাকিকতে সৃষ্ট ইখতিলাফ থেকে। আর ইস্তিসনা বিষয়ে যেসব কথা বলা হয়েছে তার সারাংশ হলো তিনটি কথা:

প্রথমত: মূল ঈমানের অস্তিত্বে সন্দেহ থেকে ইস্তিসনা বের হলে ইস্তিসনা করা হারাম। এটি হারাম, বরং কুফর। কেননা ঈমান হলো দৃঢ়তা আর সন্দেহ হলো তার বিপরীত। এই কথার ভিত্তি হলো: ঈমান একটি জিনিস মাত্র যা মানুষ নিজ থেকে জানে, যদি তার থেকে ইস্তিসনা করে তাহলে সেটি তার সন্দেহের ওপর প্রমাণ হবে। এ

জন্যেই ঈমানের ভেতর যারা ইস্তিসনা করত তাদেরকে তারা সন্দেহকারী বলতেন।

দ্বিতীয়ত: ইস্তিসনা করা ওয়াজিব: যদি ইস্তিসনা নফসকে বিশুদ্ধ ঘোষণা এবং ঈমানকে কথায়, আমলে ও বিশ্বাসে বাস্তবায়ন করার সাক্ষী দেওয়ার ভয় থেকে বের হয়। এই ইস্তিসনা করা ওয়াজিব। এই খারাপীর ভয়ে।

অনুরূপভাবে গ্রহণযোগ্য ঈমান তাই যার ওপর মানুষ মারা গেছে। কেননা মানুষ মৃত্যুর ওপর ভিত্তি করেই মুমিন ও কাফির হয়। আর এটি ভবিষ্যতের বিষয় যা জানা নেই। কাজেই তার ব্যাপারে নিশ্চয়তা বৈধ নয়।

তৃতীয়ত: ব্যাখ্যা করা:

- মূল ঈমানের অস্তিত্বে সন্দেহ থেকে ইস্তিসনা বের হলে ইস্তিসনা করা হারাম। বরং কুফর। কেননা ঈমান চূড়ান্ত বিষয় আর সন্দেহ তার পরিপন্থী বিষয়।

- আর যদি ইস্তিসনা নফসকে বিশুদ্ধ ঘোষণা এবং ঈমানকে কথায়, আমলে ও বিশ্বাসে বাস্তবায়ন করার সাক্ষী দেওয়ার ভয় থেকে বের হয়, অথবা মানুষ যার ওপর মারা যায় সেটাই হলো প্রকৃত ঈমান। কেননা মৃত্যুর ওপর নির্ভর করে মানুষ মুমিন অথবা কাফির গণ্য হয়। আর এটি ভবিষ্যতের বিষয় যা জানা নেই, কাজেই তার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া বৈধ নয়। এই ইস্তিসনা ওয়াজিব।

- যদি ইস্তিসনা থেকে উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর ইচ্ছাকে উল্লেখ করে বরকত হাসিল করা অথবা কারণ বর্ণনা করা যে, তার অন্তরে যে ঈমান রয়েছ তা আল্লাহর ইচ্ছায় রয়েছে, তাহলে এটি জায়েজ। আর এই ভাবে সম্পৃক্ত করা- অর্থাৎ কারণ বর্ণনা করা- সত্যিকার ঈমান

থাকার বিপরীত নয়। কেননা এই ভাবে ইস্তিসনা করা নিশ্চিত বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿لَّقَدۡ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءۡيَا بِٱلۡحَقِّۖ لَتَدۡخُلُنَّ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمۡ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَۖ …﴾ [الفتح: 27]

(অবশ্যই আল্লাহ তাঁর রাসলূকে স্বপ্নটি যথাযথভাবে সত্যে পরিণত করে দিয়েছেন। তোমরা ইনশাআল্লাহ নিরাপদে তোমাদের মাথা মুণ্ডন করে এবং চুল ছেঁটে নির্ভয়ে আল-মাসজিদুল হারামে অবশ্যই প্রবেশ করবে।) [আল-ফাতহ: ২৭] অনুরূপভাবে কবর যিয়ারতের দোয়াতে রয়েছে: (আমরা অচীরেই তোমাদের সাথে মিলিত হবো, যদি আল্লাহ চায়)[২৪০]" [২৪১]

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ ঈমান ও ইসলামের মাঝে সম্পর্ক।

এই মাসআলায় মাতুরীদিয়্যারা গ্রহণ করেছে যে, ইসলাম ও ঈমান একই বস্তু এবং তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই এবং তারা উভয়ে একটি অপরটি থেকে পৃথক হয় না। তাদের একটি নাই হলে অপরটিও নাই হয়। আর তাদের মাঝে বিরোধ কেবল ভাষাগত অর্থে।

আবূল মানসুর মাতুরীদী বলেনঃ "আমাদের নিকট ঈমান ও ইসলাম দীনের ভেতর উদ্দেশ্য হাসিলে একই বিষয়, যদিও উভয়টি ভাষাগত অর্থে একটি অপরটি থেকে ভিন্ন। অতঃপর তাহকিকি বিবেচনায় দীনের ভেতর ঈমান হলো, আল্লাহর একত্বের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে বিবেক ও প্রকৃতির সাক্ষ্য দেওয়ার নাম। আর সৃষ্টির মালিকানা তাঁর এবং সৃষ্টিতে নির্দেশও তাঁর। তাঁর কোনো শরীক নেই তাতে। আর ইসলাম হলো, ব্যক্তির নিজের নফসকে পুরোপুরিভাবে সোপর্দ করা অনুরূপভাবে আল্লাহর দাসত্ব মেনে নিয়ে প্রত্যেক বস্তুও

আল্লাহর। এতে কোনো শরীকনেই। কাজেই তাদের মাঝে একটি বিষয় হাসিল হলো।

অতঃপর নীতি হলো, ব্যক্তি ঈমানের সকল শর্ত বাস্তবায়ন করবে অতঃপর সে মুসলিম হবে না, অথবা ইসলামের সকল শর্ত বাস্তবায়ন করবে অতঃপর সে মুমিন হবে না এটা বিবেক থেকে অনেক দূরের কথা। কাজেই প্রমাণিত হলো হাকিকতে উভয়টি এক। আর জানা কথা যে, যাকে তার একটি দ্বারা নামকরণ করার সুযোগ হবে তাকে অপরটি দ্বারাও নামকরণ করা যাবে।” [২৪২]

মানুষেরা এই মাসআলায় তিনটি মতে বিভক্ত:

প্রথম: ইসলাম ও ঈমান একই বস্তুর নাম।

দ্বিতীয় : ইসলাম হলো কালিমা আর ঈমান হলো ফি‘ল (কর্ম)।

তৃতীয় : ব্যাখ্যা করে বলা, আর তা-ই হলো হক। কারণ, উভয়টির মিলিত থাকার অবস্থা উভয়ের পৃথক থাকার অবস্থার ভিন্ন। যখন দু’টি এক সঙ্গে ব্যবহার হয়, তখন ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য হয় বাহ্যিক আমল আর ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য হয় অভ্যন্তরীণ আমল। আর যখন উভয়টি পৃথক পৃথক ব্যবহার হয়, তখন উভয়ের অর্থ এক হয় এবং একটি অপরটির ভেতর প্রবেশ করে যায়। তখন একটি দ্বারাই উদ্দেশ্য হয় দীনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল বিষয়।

তার অর্থ হলো ইসলাম ও ঈমান কুরআন ও হাদীসের কোনো স্থানে জমা হলে প্রত্যেকটির বিশেষ বিশেষ অর্থ উদ্দেশ্য হয়। অতএব ইসলাম হলো বাহ্যিক আমল, যেমন দু’টি সাক্ষী, সালাত ... আর ঈমান হলো অভ্যন্তরীণ আমল, যেমন বিশ্বাসসমূহ তথা তাওয়াক্কুল, ভয়, মহব্বত, আশা ও আশঙ্কা ... প্রভৃতি।

অনেক দলিল এটি প্রমাণ করে, যেমন:

আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿۞ قَالَتِ ٱلۡأَعۡرَابُ ءَامَنَّاۖ قُل لَّمۡ تُؤۡمِنُواْ وَلَٰكِن قُولُوٓاْ أَسۡلَمۡنَا وَلَمَّا يَدۡخُلِ ٱلۡإِيمَٰنُ فِي قُلُوبِكُمۡۖ ...﴾ [الحجرات: 14]

(বেদুঈনরা বলল, 'আমরা ঈমান আনলাম'। বল, 'তোমরা ঈমান আননি'। বরং তোমরা বল, 'আমরা ইসলাম কবূল কর করলাম'। আর এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি।) [আল-হুজুরাত: ১৪] **ইসলাম ও ঈমান উভয়ে একই নসে জমা হয়েছে। তাদের থেকে ইমানকে অসাব্যস্ত করে ইসলামকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতএব তাদের উভয়ের পৃথক হওয়া স্পষ্ট হল। তারা মুসলিম কিন্তু মুমিন হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছেনি।**

আর জিবরীল আলাইহিস সালামের প্রসিদ্ধ হাদীস তো আছেই[২৪৩], সেখানে ইসলামের উল্লেখ রয়েছে পাঁচটি রোকনসহ আর ঈমানের উল্লেখ রয়েছে ছয়টি মূলনীতিসহ। কেননা উভয়টি একই হাদীসে জমা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকটির উত্তর এমন অর্থে দিয়েছেন যা অপরটি থেকে ভিন্ন। অতএব তাদের উভয়ের পৃথক হওয়া প্রমাণিত হল।

আর উভয়টির পৃথক হওয়ার অর্থ হলো, কোনো নসে একটি অপরটি ছাড়া আসবে। তখন একটি অপরটির অর্থে হবে। তখন ইসলাম হবে ঈমান আর ঈমানও হবে ইসলাম।

এর অনেক দলিল রয়েছে দুই প্রকার ওহীতেই। তন্মধ্যে সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥﴾ [آل عمران: 85]

আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। [আলে ইমরান : 85] **তার শুরুতে রয়েছে আল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতালার বাণী:**

﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ ...﴾ [آل عمران: 19]

(নিশ্চয় আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দীন হচ্ছে ইসলাম) [আলে ইমরান : ১৯] **অতএব আয়াতের দাবি হলো, নিশ্চয় আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দীন হচ্ছে ঈমান, আর কেউ ঈমান ব্যতীত অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না। তন্মধ্যে অনেক আয়াতে মুমিনদের সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলার বাণী: (হে মুমিনগণ) সম্বোধনটি তাদেরকেও নির্দেশ করে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু তাদের অন্তরে এখন পর্যন্ত ঈমান প্রবেশ করেনি, যা প্রমাণ করে যে, একাকীর সময় একটি অপরটিকে নিয়ে নেয়। দু'টি পৃথকভাবে ব্যবহার হলে একই অর্থ প্রদান করে সুন্নাহ থেকে তার পক্ষে সবচেয়ে স্পষ্ট দলিল হলো আবদুল কায়েস-এর প্রতিনিধি দলের হাদীস, যার বিশুদ্ধতার ওপর ঐকমত্য রয়েছে। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট আগমন করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ও আপনার মধ্যে মুযার গোত্রীয় কাফিরদের বসবাস। কাজেই হারাম (সম্মানীত) মাসগুলো ব্যতীত অন্য কোনো সময় আমরা আপনার নিকট আগমন করতে পারি না। তাই আমাদের কিছু স্পষ্ট নির্দেশ দিন, যাতে করে আমরা যাদের পিছনে ছেড়ে এসেছি তাদের অবগত করতে পারি এবং তার দ্বারা যাতে করে আমরা জান্নাতে দাখিল হতে পারি? তখন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,** (আমি তোমাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমানের নির্দেশ দিচ্ছি। তোমরা কী জান এক আল্লাহর প্রতি

ঈমান কী? তাঁরা বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত।' তিনি বললেন, তোমরা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে, রমাযানের সিয়াম পালন করবে আর তোমরা গানীমাতের সম্পদ হতে এক-পঞ্চমাংশ আদায় করবে।) [২৪৪]

কেননা হাদীসটিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের আরকান দ্বারা ঈমান (-এর পরিচয়) সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন তাদেরকে। এটি প্রমাণ করে যে, তারা উভয় একই অর্থের ধারক। যা ফায়দা দেয় যে, পৃথকভাবে ব্যবহার হওয়ার সময় একটি অপরটির মোকাবেলায় যথেষ্ট হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেঃ কবিরাহ গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির হুকুম।

মাতুরীদিয়্যার গ্রহণ করেছে যে, কবিরা গুনাহকে হালাল না জেনে তাতে লিপ্ত ব্যক্তি ঈমান থেকে বের হবে না আবার কুফরিতেও প্রবেশ করে না। বরং সে তাসদীক দূর না হওয়ার কারণে পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী মুমিন। আবার সে আল্লাহর আনুগত্য না করা ও পাপ-পঙ্কিলতায় লিপ্ত হওয়ার কারণে ঈমানসহ ফাসিক ও শাস্তির উপযুক্ত।

তারা বলেছে, যখন কবিরাহ গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি তাওবাহ ছাড়া মারা যাবে তখন সে (আল্লাহর) ইচ্ছাধীন থাকবে। যদি চান তাকে শাস্তি দিবেন আর যদি চান তাকে ক্ষমা করবেন। আর শাস্তিপ্রাপ্ত হলেও জাহান্নাম থেকে অবশ্যই বের হবে।

আবূল মুয়ীন আন-নাসাফী বলেন, "আহলুল হকগণ বলেন, যে কবিরা গুনাহে লিপ্ত হলো পাপকে হালাল না জেনে এবং যে পাপ

থেকে নিষেধ করেছেন তার প্রতি অবজ্ঞা না করে, বরং প্রবৃত্তি অথবা গোঁড়ামীবশত তাতে লিপ্ত হলো। আর আল্লাহর কাছে আশা করে যে, তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং ভয়ও করে যে, তাকে তার ওপর শাস্তি দিবেন। এই ব্যক্তির নাম মুমিন। সে তার পূর্বের ঈমানের ওপর বিদ্যমান আছে। তার ইমান তার থেকে দূরীভূত হয়নি, হ্রাসও পায়নি। বস্তুত সে যে দরজা দিয়ে ঈমানে প্রবেশ করেছে সে দরজা ছাড়া তার থেকে বের হবে না। তার বিধান হলো, যদি সে তাওবা ছাড়া মারা যায়, তাহলে তার ভেতর আল্লাহর ইচ্ছা কার্যকর হবে। তিনি যদি চান তাকে ক্ষমা করবেন স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ায় অথবা তার সঙ্গে যে ঈমান ও নেক আমল রয়েছে তার বরকতে অথবা কোনো নেককার লোকের সুপারিশের ফলে। আর যদি চান তাকে তার পাপের পরিমাণ শাস্তি দিবেন, তারপর তার শেষ ঠিকানা হবে অবশ্যই জান্নাত। সে জাহান্নামে স্থায়ী হবে না।

আর মুমিন নাম বাকী থাকবে, কারণ ঈমান হলো তাসদীক (বিশ্বাস করা) আর কুফর হলো তাকযীব (মিথ্যারোপ করা)। এই যে ব্যক্তি এই কবিরা গুনাহে লিপ্ত হল তার সঙ্গে তাসদীক বাকি ছিল। আর যতক্ষণ তাসদীক বাকি আছে তাকযীব বাকি থাকবে না, কারণ উভয়ের মাঝে বৈপরীত্ব বিদ্যমান। কাজেই তার ভেতর তাকযীব নেই, তবু তাকে কাফির বলা, অথবা তার ভেতর তাসদীক বিদ্যমান, তবু তার ঈমান নেই বলা, অথবা তার অন্তরে তাসদীক স্থির রয়েছে, তবু তার ভেতর নিফাক সাব্যস্ত করা, এমন কথা যা সুস্পষ্ট বাতিল। অতঃপর তার ওপর ফাসিক নামটি প্রয়োগ হওয়ার কারণ হলো, সে আনুগত্যের সীমানা থেকে বের হয়েগেছে। আর ফিসক-এর অভিধানিক অর্থ হলো বের হওয়া।অধিকন্তু আনুগত্য থেকে বের হওয়া তাসদীকের বিপরীত নয়, কাজেই তাসদীক বাকি থাকবে। আর যখন তাসদীক বাকি থাকল তখন তাসদীককারী অবশ্যই মুমিন হবে"। [২৪৫]

কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ওপর বিধান আরোপে হক ও সঠিক হুকুম হলো, দুনিয়ার বিধানে বলা হবে, “সে ত্রুটিপূর্ণ ঈমান ওয়ালা মুমিন। তার ঈমানের কারণে সে মুমিন আর তার কবিরা গুনাহের কারণে সে ফাসিক। তাকে পূর্ণ ঈমানের নাম দেওয়া হবে না, কেননা কুরআন ও সুন্নাহ তার থেকে পূর্ণ ঈমানের নামকে নাকচ করেছে। আর ঈমান নামটি আল্লাহ ও তার রাসূল যে আদেশ ও নিষেধ করেছেন তার ভেতর ব্যক্তিকে শামিল করে। কারণ, আল্লাহর আদেশ তার ওপর ওয়াজিব এবং তার নিষেধ তার ওপর হারাম। তার জন্যে তা আবশ্যক যেমন অন্যের জন্যে তা আবশ্যক।”[২৪৬]

আর তাদের কথা যে, কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি তাওবাহ ছাড়া মারা গেলে আল্লাহর ইচ্ছাধীন হবে, যদি তিনি চান তাকে ক্ষমা করবেন আর যদি চান তাকে শাস্তি দিবেন, অতঃপর তার শেষ ঠিকানা হলো জান্নাত এবং সে জাহান্নামে স্থায়ী হবে না। এই মাসআলায় এটিই হলো সঠিক কথা আর এটিই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত ও এই উম্মতের পূর্বসূরীদের মাযহাব।

তাহাভী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত থেকে কবিরাহ গুনাহকারীরা তাওহীদের হালতে মারা গেলে জাহান্নামে স্থায়ী হবে না, আল্লাহর সঙ্গে ঈমানের সাথে সাক্ষাত করার পর, যদিও তারা তাওবাকারী না হয়। তারা আল্লাহর ইচ্ছা ও তার ফয়সালার অধীনে থাকবে। যদি তিনি চান নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে ক্ষমা করবেন, যেমন তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন তিনি:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ ...﴾ [النساء: 48]

(নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি ক্ষমা করেন এ ছাড়া অন্যান্য পাপ, যার জন্য তিনি চান।) [আন-নিসা : ৪৮] আর যদি চান নিজ ইনসাফের ভিত্তিতে তাদেরকে জাহান্নামে শাস্তি দিবেন। অতঃপর নিজ রহমতে ও তার আনুগত্যকারীদের

থেকে সুপারিশকারীদের সুপারিশে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন অতঃপর তাদেরকে জান্নাতে পাঠাবেন। তার কারণ হলো, আল্লাহ তা‘আলা তার পরিচয় লাভকারীদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে এমন লোকদের মত করেননি, যারা তার অপছন্দের পাত্র, হিদায়েত থেকে বঞ্চিত এবং তার নৈকট্য হাসিল করতে পারেনি। হে আল্লাহ, হে ইসলাম ও মুসলিমদের অভিভাবক আপনি আমাদেরকে আপনার সঙ্গে সাক্ষাত না করা পর্যন্ত ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।”[২৪৭]

পঞ্চম অধ্যায়ঃ মাতুরীদিয়্যাহ ও আশায়েরাদের মাঝে তুলনা

এতে দু''টি পরিচ্ছেদ রয়েছে:

প্রথম পরিচ্ছেদঃ মাতুরীদিয়্যাদের ও আশায়েরাদের মাঝে হাকিকিভাবে বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ তাদের মাঝে শাব্দিকভাবে বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহ।

ভূমিকাঃ

মাতুরীদিয়্যাদের আকিদা ও আশায়েরাদের আকিদার মাঝে দৃষ্টিদানকারী তাদের উভয়ের মাঝে অনেক নৈকট্য ও কাছাকাছি লক্ষ্য করবে। এই নৈকট্যই তাদের মাঝে ঐক্য ও মহব্বত সৃষ্টি করেছে। এমন কি তারা উভয় একে অপরের ওপর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত নামটি প্রয়োগ করেন।

আর স্পষ্ট হয় যে—আল্লাহই ভালো জানেন—মাতুরীদিয়্যারা কুল্লাবিয়্যাদের থেকে বের হওয়া একটি দল। আশআরিয়ারাও তেমন।

এর ওপর প্রমাণ হলো, মাতুরিদিরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিশেষণে বিশেষিত তা হলো তাকওয়ীনকে (সৃষ্টি করার ক্ষমতাকে) তারা আযালি (আদি) বলেন। আর এটিই কুল্লাবিয়্যারা বলেছেন মাতুরীদিয়্যাদের আত্মপ্রকাশ করারও আগে। অধিকন্তু কুল্লাবীদের মাযহাব সায়হুন ও জায়হুন নদীর তীরবর্তী (মধ্য এশিয়ার) দেশসমূহে প্রচারিত ছিল, যেই দেশে মাতুরীদী জীবন-যাপন করেছেন এবং যেখানে তিনি মারা গেছেন।

এ কারণে, স্বাভাবিকভাবেই মাতুরীদী স্বীয় কুল্লাবী শায়খদের থেকে ইলম গ্রহণ করেছেন ও তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এর দ্বারাই আশায়েরাহ ও মাতুরীদিয়্যাদের মাঝে নৈকট্যের গোপন রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন [২৪৮]।

সুবকী —একজন আশআরি আলেম—তবকাত গ্রন্থে বলেন, "আমি হানাফীদের কিতাবসমূহে অনেক তালাশ করেছি (হানাফীদের দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য মাতুরীদিয়্যারা। কারণ, তারা হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন)তারপর পেলাম যে, যেসব মাসআলায় আমাদের ও হানাফীদের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে তা মাত্র তেরোটি মাসআলা। তার ভেতর ছয়টি মর্মগত ও বাকিগুলো শব্দগত। আর সেই ছয়টি মাসআলাও কাফির ও বিদআতি বলার ক্ষেত্রে আমাদের সাঙ্গে তাদের বিরোধ, আবার তাদের সঙ্গে আমাদের বিরোধকেও দাবি করে না। আমার একটি নুনিয়্যাহ কবিতা রয়েছে, তাতে এই মাসআলাগুলো জমা করেছি। তার সঙ্গে আরো এমন কিছু মাসআলা জমা করেছি, যেখানে আশআরিরা ইখতিলাফ করেছেন, যদিও মূল আকিদায় একে অপরকে সঠিক বলেছেন এবং তাদের দাবি যে, তারা সবাই সুন্নাহের ওপর রয়েছেন।" [২৪৯]

অনুরূপ বায়াধী তার "ইশারাতুল মারাম" কিতাবে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন আশআরি ও মাতুরীদিয়্যাদের মাঝে বিরোধপূর্ণ মাসআলা বর্ণনার জন্যে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তাদের মাঝে পঞ্চাশটি মাসআলায় বিরোধ রয়েছে। অনুরূপভাবে পুরো কিতাবে বিরোধপূর্ণ মাসআলাগুলোকে দলিলসহ বর্ণনা করার প্রায়াস পেয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আশআরি ও মাতুরিদিদের মাঝে ইখতিলাফ অর্থগত, আর তাও শাখাগত বিষয়ে যার ফলে একে অপরকে বিদআতি বলা আবশ্যক হয় না। এ কারণে কিতাবটিকে আশআরি ও মাতুরিদিদের মধ্যকার ইখতিলাফ জানার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ উৎস গণ্য করা হয়[২৫০]।

জাহিদ আল-কাওসারী বলেনঃ “অতএব আশআরী ও মাতুরীদী দু‘জনই দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিমে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ইমাম। তাদের অগণিত কিতাব রয়েছে। আর এই দুই ইমামের মাঝে যে ইখতিলাফ সংঘটিত হয়েছে তার অধিকাংশ শাব্দিক ইখতিলাফ। এর ওপর অনেক কিতাব রচনা করা হয়েছে। তা সংক্ষেপে সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন বায়াধী “ইশারাতুল মারাম ফি ইবারাতিল ইমাম”-কিতাবে। যুবাইদী তা “শারহুল ইহয়া” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন[২৫১]।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ তাদের মাঝে হাকিকিভাবে বিতর্কীত মাসআলাসমূহ[২৫২]।

গুরুত্বপূ্র্ণ এমন কিছু মাসআলার উল্লেখ, যেখানে মাতুরীদিয়্যাহ ও আশআরিদের মাঝে ইখতিলাফ সংঘটিত হয়েছে কেবল শাব্দিকভাবেই নয়, হাকিকিভাবে আবার কেবল শাখাগতভাবেই নয়, মৌলিকভাবে।

প্রথম মাসআলা: আল্লাহ তা‘আলার পরিচয়: মাতুরীদিয়্যারা বলেন, আল্লাহ তা‘আলার মা‘রিফাত (পরিচয় জানা) বিবেকের দ্বারাই ওয়াজিব হয়। আল্লাহ যদি মানুষের জন্যে কোনো রাসূল প্রেরণ না করতেন তবু তাদের বিবেকের দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্ব, তার একত্ব এবং তিনি যেসব গুণে গুণান্বিত তা জানা ওয়াজিব ছিল। এবং তিনিই জগতের স্রষ্টা ও তার অস্তিত্বদানকারী, এমনকি যার নিকট ওহী পৌঁছেনি সেও অপারগ গণ্য হবে না।

পক্ষান্তরে আশআরিগণ বলেন, আল্লাহর মা‘রিফাত (পরিচয় জানা) শরীয়তের দ্বারাই ওয়াজিব হয়। শরীয়ত বর্ণিত হওয়ার আগে ঈমান ওয়াজিব ও কুফর হারাম হয় না। এ জন্যে তারা বলেন, উঁচু পাহাড়ে লালিত-পালিত ব্যক্তি যার কাছে ওহী পৌঁছেনি সে অপারগ গণ্য হবে।

দ্বিতীয় মাসআলাহ: ইরাদার (ইচ্ছার) বিশেষণ: মাতুরীদিয়্যারা গ্রহণ করেছেন যে, ইরাদাহ সন্তুষ্টি ও মুহাব্বতকে আবশ্যক করে না। আর আশায়েরাগণ গ্রহণ করেছেন যে, মুহাব্বত, সন্তুষ্টি ও ইরাদাহ একই অর্থ প্রদানকারী।

তৃতীয় মাসআলা: কালামের সিফাত (কথার বিশেষণ): মাতুরীদিয়্যারা গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহর কালাম (কথা) শোনা যায় না, বরং তার কথার প্রতিনিধিত্বকারী শব্দ ও হরফ শোনা যায়। কাজেই মূসা এমন কিছু শব্দ ও হরফ শুনেছেন আল্লাহ তার কথার প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে যা সৃষ্টি করেছেন।

আর আশআরিগণ গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার কথা শ্রবণ করা সম্ভব, মূসা আলাইহিস সালাম যা শুনেছেন তা ছিল আল্লাহর কালামে নফসী। আর তা হয় শ্রবণকারীর ভেতর ইদরাক (বুঝার যোগ্যতা) সৃষ্টির মাধ্যমে।

চতুর্থ মাসআলা: তাকওয়ীনের সিফাত (সৃষ্টি করার বিশেষণ): মাতুরীদিয়্যাগণ বলেছেন যে, তাকওয়ীন (সৃষ্টি করা) আল্লাহ তা'আলার আদি সিফাত আর তাকওয়ীন মুকাওওয়িনের (স্রষ্টার) বিপরীত।

আর আশআরিগণ গ্রহণ করেছেন যে, তাকওয়ীন (সৃষ্টি করা) আল্লাহ তা'আলার সিফাত নয়, বরং তা হলো আপেক্ষিক বিষয় যা প্রভাবের প্রতি প্রভাবকের সম্পর্ক থেকে বিবেকের ভেতর হাসিল হয়। এ জন্যে তারা বলেছেন, তাকওয়ীন হলো হুবহু মুকাওওয়ান (সৃজিত বস্তু) এবং তা হলো ক্ষণস্থায়ী।

পঞ্চম মাসআলা: সাধ্য নেই এমন বস্তুর দায়িত্ব প্রদান: মাতুরীদিয়্যাগণ গ্রহণ করেছেন যে, সাধ্য নেই এমন বস্তুর দায়িত্ব প্রদান করা বৈধ নয়। পক্ষান্তরে জমহুর আশআরীগণ গ্রহণ করেছেন যে, সাধ্য নেই এমন বস্তুর দায়িত্ব প্রদান করা বৈধ।

ষষ্ঠ মাসআলা : আল্লাহ তা'আলার কর্মসমূহে হিকমত ও কারণ: মাতুরীদিয়্যগণ গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহর কর্মসমূহে হিকমত থাকা আবশ্যক এবং কোনো অবস্থাতেই তার কর্মের হিকমত থেকে খালি হওয়া বৈধ নয়।

পক্ষান্তরে আশআরীগণ গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহর কর্মসমূহে কারণ ও হিকমত না থাকা। তারা বলেন, আল্লাহর কর্মসমূহ কারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এবং তাঁর কর্মসমূহকে উদ্দেশ্য ও কারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা বৈধ নয়।

সপ্তম মাসআলা: সুন্দর ও অ-সুন্দর নির্ণয় করা: মাতুরীদিয়্যাগণ গ্রহণ করেছেন যে, বিবেকই বস্তুসমূহের সৌন্দর্য ও কদর্যতা বুঝতে পারে। অর্থাৎ তারা সুন্দর ও অ-সুন্দরকে দু'টি বিবেকী বিষয় বলেন।

পক্ষান্তরে আশআরীগণ গ্রহণ করেছেন যে, বিবেক দ্বারা বস্তুসমূহের সৌন্দর্য ও কদর্যতা বুঝা যায় না, বরং শরীয়তের দ্বারাই তা জানা যায়।

অষ্টম মাসআলা: ইস্তেতাআত (সামর্থ): জমহুর মাতুরিদিগণ গ্রহণ করেছেন যে, ইস্তিতাআত (সামর্থ) দুইভাবে হয়:

প্রথম: উপায় ও উপকরণসমূহের নিরাপদ হওয়া। আর তা কর্মের পূর্বে হয়।

দ্বিতীয়: এমন ইস্তিতাআত (সামর্থ) যার দ্বারা কর্ম তৈরি হয় এবং তা কর্মের সঙ্গে হয়।

পক্ষন্তরে আশআরীগণ গ্রহণ করেছেন যে, ইস্তিতাআত (সামর্থ) কর্মের সঙ্গে ছাড়া হয় না। তার আাগে হওয়া বা তার পরে হওয়া বৈধ নয়।

নবম মাসআলা: কাসব (উপার্জন): মাতুরীদিয়্যা ও আশআরীগণ একমত যে, বান্দার কর্মসমূহ আল্লাহর মাখলুক (সৃষ্ট), আর তা হলো বান্দার পক্ষ থেকে উপার্জিত। কিন্তু তারা উপার্জনের অর্থে দ্বিমত পোষণ করেছেন।

মাতুরীদিগণ বলেন, আল্লাহর কুদরতই হলো মূল কর্মে প্রভাবক। আর বান্দার কুদরত প্রভাবক হলো কর্মের বিশেষণে। বান্দার এই প্রভাবই হলো কাসব (উপার্জন)। অতএব মাতুরীদিয়্যাদের নিকট বান্দার কুদরতের প্রভাব রয়েছে কর্মের ভেতর। তবে সৃষ্টি করার ভেতর তার কোনো প্রভাব নেই। কেননা সৃষ্টি করা একমাত্র আল্লাহর কাজ। তবে তার (বান্দার কুদরতের) প্রভাব থাকে কেবল ইচ্ছা ও কর্ম নির্বাচন করার ভেতর।

পক্ষান্তরে আশআরীদের নিকট কাসব (উপার্জন) হলো: বান্দাদের ইচ্ছাধীন কর্মসমূহ একমাত্র আল্লাহর কুদরতে সংঘটিত হয়। তাদের কুদরতের জন্যে তাতে কোনো প্রভাব নেই, বরং আল্লাহ নিজের নিয়ম করেছেন যে, তিনি বান্দার ভেতর কুদরত ও ইচ্ছা সৃষ্টি করবেন। যখন তাতে কোনো বাধা না থাকে তখন তার ভেতর ইচ্ছা ও কুদরতের সঙ্গে তার সামর্থের কর্মটি সৃষ্টি করেন। কাজেই কর্মটি সূচনা ও সৃষ্টির থেকে আল্লাহর সৃজিত ও বান্দার উপার্জিত। আর তার সেটি উপার্জন করার উদ্দেশ্য হলো: কর্মটির বান্দার কু ুদরত ও ইচ্ছার সঙ্গী হওয়া মাত্র, তবে কর্মে তার কোনো প্রভাব অথবা কর্মের অস্তিত্বে তার কোনো দখল থাকবে না, সে কেবল কর্ম সংঘটিত হওয়ার স্থান মাত্র।

দশম মাসআলা: মুকাল্লিদের (অন্ধঅনুসারীর) ঈমান:মাতুরীদিয়্যারা গ্রহণ করেছে যে, যে ব্যক্তি কারো অন্‌অন্ধনুসারী হয়ে দীনের রোকনসমূহ বিশ্বাস করল তার ঈমান সহীহ হবে।

পক্ষান্তরে আশআরীগণ গ্রহণ করেছে যে, মুকাল্লিদের ঈমান সহীহ নয়। আর তারা বলেছে, ঈমান বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত হলো প্রত্যেকটি মাসআলা বিবেকি অকাট্য দলিল দ্বারা বুঝতে ও জানতে হবে।

একাদশ মাসআলা: সাওয়াব ও শাস্তি। মাতুরীদিয়্যা ও আশআরীগণ একমত হয়েছেন যে, আনুগত্যকারীকে শাস্তি ও পাপীকে সাওয়াব দেয়া বৈধ নয়। তবে তাদের মাঝে ইখতিলাফের জায়গা হলো অনুধাবক (অনুধাবনকারী) নিয়ে। মাতুরিদিরা গ্রহণ করেছে যে, সেটির অনুধাবক হলো বিবেক ও শরীয়ত।

পক্ষান্তরে আশআরীগণ গ্রহণ করেছে যে, সেটির অনুধাবক হলো শরীয়ত।ফলে মাতুরীদিয়্যাগণ অনুগত্যকারীকে শাস্তি দেওয়া ও পাপীকে সাওয়াব দেওয়ার বৈধতা অস্বীকার করেন, পক্ষান্তরে আশআরীগণ তা স্বীকার করেন[২৫৩]।

দ্বাদশ মাসআলা: নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া: যেমন মাতুরীদিয়্যাগণ বলেছেন যে, নবীগণ সকল কবিরা ও খারাপ থেকে পবিত্র বিশেষভাবে যার সম্পর্ক রয়েছে শরীয়তের সঙ্গে, তার বিধান পৌঁছানো ও উম্মতের নির্দেশা/নসিহতের সঙ্গে।

মাতুরীদিয়্যারা আরো গ্রহণ করেছেন যে, নবীগণ সাগিরা থেকে নিষ্পাপ এবং কুরআন ও সুন্নাহের যেসব দলিল তাদের থেকে সগিরা প্রকাশ পাওয়ার আভাস দেয় এবং যার কারণে কতক মানুষ ভুলে পতিত হয়ে তাদের ওপর সাগিরা পাপকে বৈধ বলেছেন, সেসব দলিলে ব্যাখ্যা করা ওয়াজিব করেছেন তারা। অতএব নবীগণ সাগিরা, কাবিরা ও সকল পাপ থেকে পবিত্র-নিষ্পাপ।

যেখানে আশআরীগণ গ্রহণ করেছেন যে, নবীগণ থেকে নবুওয়াতের পূর্বে সাগিরা প্রকাশ পায়, যদি সেটি ঘৃণিত না হয় এবং তা

অস্বীকার করার কোনো দলিল নেই। তা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক। তবে নবুওয়তের পর তারা এমন সব জিনিস ইচ্ছায় করা থেকে বিরত থাকেন, যা তাদের সততাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, যদিও তা সাগিরা হয়[২৫৪]।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ তাদের মাঝে শব্দগত ইখতিলাফি মাসআলাসমূহ[২৫৫]।

শব্দগত ইখতিলাফি মাসআলাসমূহ হলো:

প্রথম মাসআলা: সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য: মাতুরিদিরা মনে করেন যে, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য বর্তমান অবস্থায় হয়, আদিগত নয় তা। এ হিসেবে বর্তমান যে মুমিন সে সৌভাগ্যবান, যদি সে কুফরির ওপর মারা যায়, তাহলে সৌভাগ্যবান থেকে হতভাগায় পরিণত হল। আবার বর্তমান যে কাফির সে দুর্ভাগা, যদি সে ঈমানের ওপর মারা যায়, তাহলে সৌভাগ্যবান রূপান্তরিত হল।

আর আশআরীদের নিকট সৌভাগ্যের অর্থ হলো ঈমানের ওপর মারা যাওয়া, আর সেটি নির্ধারিত হয় আদিতে তার সম্পর্কে আল্লাহর ইলমের ভিত্তিতে। অনুরূপ দুর্ভাগ্য হলো কুফরির ওপর মারা যাওয়া। এ হিসেবে তাদের নিকট সৌভাগ্য যেমন আদিগত, দুর্ভাগ্যও আদিগত। কাজেই সৌভাগ্যবান দুর্ভাগা হয় না আর দুর্ভাগা সৌভাগ্যবান হয় না।

দ্বিতীয় মাসআলা: রাসূলদের মারা যাওয়ার পরেও তাদের রিসালাত বাকি থাকা: মাতুরিদিদের নিকট নবী ও রাসূলগণ মারা যাওয়ার পরেও তাদের নবী ও রাসূল হওয়ার বৈশিষ্ট্যসহ বিদ্যমান থাকেন।

পক্ষান্তরে আশআরীগণ মনে করেন যে, নবী ও রাসূলগণ তাদের মৃত্যুর পর রিসালাতের হুকুমে থাকেন, আর কোনো জিনিসের হুকুম

তার মূল জিনিসের স্থানেই অবস্থান করে। এর দ্বারা স্পষ্ট হল যে, উভয় দল মুল মাসআলায় একমত আর তাহলো রিসালাহ এখন পর্যন্ত বাকি আছে, তবে ইখতিলাফ হলো তা হাকিকিভাবে বাকি না হুকমিভাবে বাকি।

তৃতীয় মাসআলা: ইরাদাহ (ইচ্ছা): এটি (আল্লাহর) সন্তুষ্টি ও মুহাব্বাতকে আবশ্যক করে কিনা? মাতুরিদিরা বান্দার কর্মসমূহকে অন্তর্ভুক্তকারী আল্লাহর ব্যাপক ইচ্ছাকে সাব্যস্ত করেন। কেননা বান্দাদের কর্মসমূহ আল্লাহর মাখলুক। আর আল্লাহর ব্যাপক ইচ্ছাকে অস্বীকার করার অর্থ হলো: তাদের কর্মের ওপর আল্লাহর কুদরত না থাকা। কাজেই ব্যাপক কুদরত, ব্যাপক ইচ্ছা ও ব্যাপক ইলমকে স্বীকার করা উলুহিয়্যাতের সিফাতসমূহের পূর্ণতার অংশ।

তবে মাতুরিদিরা বলেন, ইরাদার (ইচ্ছার) সিফাতে কোনো মহব্বত নেই এবং এই ইরাদাহ সন্তুষ্টি ও মুহাব্বতকে আবশ্যক করে না।

পক্ষান্তরে আশআরীগণ মনে করেন, ইরাদাই হলো সন্তুষ্টি ও মুহাব্বত। কেননা মুহাব্বতই হচ্ছে ইরাদাহ। অনুরূপভাবে রিধার (সন্তুষ্টির) অর্থ হলো ইরাদাহ। ইরাদাহ রিধা ও মুহাব্বাতকে আবশ্যক করে। এ হিসেবে ইরাদাহ, মুহাব্বত, মাশইয়াহ, রিধা ও ইচ্ছা সব একই অর্থ প্রদানকারী।

চতুর্থ মাসআলা: ঈমানের ভেতর ইস্তিসনা করা (ইনশাআল্লাহ বলা): মাতুরিদিরা ঈমানের সংজ্ঞা বর্ণনা করেন যে, তা হলো অন্তরে বিশ্বাস করা ও মুখে স্বীকার করা আর আশআরিরা তার সংজ্ঞা বর্ণনা করেন যে, তা হলো আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস।

মাতুরিদীরা গ্রহণ করেছেন যে, ঈমানের ভেতর ইস্তিসনা না করা। তাদের নিকট মুমিন সত্যিকার মুমিন হবে, ইচ্ছার ওপর মুমিন হবে না। তার কারণ, মাতুরিদীরা মনে করেন যে, ইস্তিসনা হলো মুমিনের

ঈমানে একটি সন্দেহ আর সন্দেহকে কবুল না করা হলো ঈমানের একটি শর্ত।

অপর দিকে আশআরীগণ গ্রহণ করেন যে, ঈমানের ভেতর ইস্তিসনা করা বৈধ, অতএব মুমিনের পক্ষে "আমি মুমিন ইনশাআল্লাহ" বলা সম্ভব।

এর দ্বারা ইখতিলাফের স্থানটি স্পষ্ট হলো যে, মাতুরিগিণ ঈমানের ভেতর ইস্তিসনাকে বৈধ বলেন না, পক্ষান্তরে আশআরিগণ তা বৈধ বলেন।

পঞ্চম মাসআলা: মুকাল্লিদের(অন্ধঅনুসারির) ঈমান: মাতুরীদিয়্যাগণ গ্রহণ করেছেন যে, মুকাল্লিদের ঈমান বিশুদ্ধ। কেননা এই ঈমানের সঙ্গে তাসদীক রয়েছে। আর তাসদীক-ই হলো মূল ঈমান। দীনি আকিদার ক্ষেত্রে তাকলীদের ওপর যথেষ্ট করা তাদের নিকট বৈধ। তবে মুকাল্লিদ গবেষণার উপযুক্ত হলে তা ত্যাগ করার দরুন পাপী হবেন।

পক্ষান্তরে আশআরীগণ বলেন, দীনি আকিদার ক্ষেত্রে তাকলীদের ওপর যথেষ্ট করা বৈধ নয়। দলিল থেকে সৃষ্ট দৃঢ় বিশ্বাস থাকা অবশ্যই জরুরি। কেননা ঈমান হলো মৌলিক মাসআলাসমূহের একটি। আর এটি খুব কমই আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। ফলে তাতে মোটের ওপর মা'রিফাত হাসিল করাই যথেষ্ট হবে। আর তা ব্যক্ত করার ক্ষমতা অর্জন করা তাদের নিকট শর্ত নয়। তারা আরো গ্রহণ করেছেন যে, মুকাল্লিদ গবেষণা ও দলিল পরিহার করার কারণে পাপী হবে, তবে সে কাফির কিংবা মুশরিক হবে না।

ষষ্ঠ মাসআলা: আল-কাসব (উপার্জন): মাতুরীদিয়্যাগণ বান্দার জন্যে এমন কুদরত ও ইচ্ছাকে সাব্যস্ত করেন যার প্রভাব কর্ম সংঘটনে রয়েছে। তবে তার প্রভাব ওয়াজিব করা ও সৃষ্টি করার ভেতর

নেই। তার প্রভাবটি কেবল কর্মের বিশেষণে স্থির করা হবে, কারণ সেটি হয়তো ইবাদত কিংবা পাপ। এই কুদরতটি প্রকাশ পাবে ইচ্ছাতে ও কর্ম নির্বাচন করার ভেতর। আল্লাহ তা'আলা কর্মের ওপর বান্দার জন্যে কুদরত সৃষ্টি করেন। তার ওপরই কর্মের ফলটি নির্ভরশীল হয়। এর দ্বারাই মাতুরীদিয়্যারা সাব্যস্ত করেন যে, বান্দার স্বীয় কর্ম গ্রহণে ইচ্ছা রয়েছে। দুনিয়াতে এসব কর্মের ওপরই প্রশংসা ও নিন্দা সাব্যস্ত হয়, যেমন তার ওপর আখিরাতে সাওয়াব ও শাস্তি সাব্যস্ত হবে।

আর আশআরীগণ গ্রহণ করেছেন যে, বান্দাদের যেই কুদরতের ফলে কর্ম সংঘটিত হয় তা মাখলুক নয়। তবে তার বিষয়টি তাদের হাতে রয়েছে এবং তার ওপর-ই তাদেরকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। আশআরীদের নিকট ইরাদাহ হলো জুযঈ (আংশিক) ইরাদাহ। আর তাদের নিকট কুল্লি (পুরো) ইরাদাহ হলো আল্লাহ তা'আলার মাখলুক।

সপ্তম মাসআলা: কাফিররা নিআমত প্রাপ্ত কিনা? মাতুরীদিয়্যাগণ মনে করেন যে, কাফিররা নিআমতপ্রাপ্ত, তবে এই নিআমত শুধু দুনিয়াতে সংঘটিত হয়েছে।

আর আশআরীগণ মনে করেন যে, কাফিররা দুনিয়া ও আখিরাত কোথাও নিআমতপ্রাপ্ত নয়[২৫৬]।

উপসংহারঃ

আকিদার যেসব মাসআলায় মাতুরীদিয়্যারা সালাফদের বিরোধিতা করেছেন তার সারাংশ।

এই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা শেষে মাতুরীদিয়্যারা যেসব গুরুত্বপূর্ণ মাসআলায় সালাফদের বিরোধিতা করেছেন তা হলো নিম্নরূপ:

১-মাতুরিদিদের তাওহীদের অর্থে ইখিতিলাফ। কারণ, তাদের নিকট তাওহীদ অর্থ হলো, আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় সত্ত্বায় এক, তার কোনো ভাগ ও অংশ নেই, তার সিফাতে তিনি এক, তার কোনো সাদৃশ্য নেই এবং তার কর্মে তিনি এক, তার কোনো শরীক নেই।

২- মাতুরীদিয়্যারা আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্যে ‘বিশেষণ’ ও ‘শরীর’ ক্ষণস্থায়ী হওয়ার ওপর নির্ভর করেছেন।

৩- মাতুরীদিয়্যারা আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের বাণী দ্বারা তার তাওহীদের ওপর দলিল পেশ করেন:

﴿لَوۡ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلۡعَرۡشِ عَمَّا يَصِفُونَ٢٢﴾ [الأنبياء: 22]

যদি এতদুভয়ের (আসমান ও যমীনের) মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতীত আরো অনেক মাবূদ থাকত, তাহলে উভয়ই বিশৃংখল হত। অতএব, তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ কতই না পবিত্র। [আল-আম্বিয়া: ২২] [তারা এই আয়াত থেকে একটি দলিল বের করেন) আর যার নামকরণ করা হয় (তামানু’) এর দলিল বলে। সালাফগণ তাদেরকে এই অর্থ প্রমাণে ভুল সাব্যস্ত করেছেন, তবে সালাফগণ স্বীকার করেন যে, দু’জন মাবূদ থেকে জগতের সৃষ্টি হওয়া

অসম্ভব হওয়ার ক্ষেত্রে ‘তামানু’ এর দলিল সহীহ, কিন্তু আয়াত থেকে এটি উদ্দেশ্য নয়।

৪- মাতুরীদিয়্যাণ সকল আস-মাউল হুসনা সাব্যস্ত করেন, কারণ বর্ণিত ইলম তার ওপর দলিল। তবে তারা নামসমূহ সাব্যস্ত ও তার অর্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে সীমালঙঘন করেছেন, কারণ কোনগুলো নামের অধ্যায়ে এসেছে আর কোনগুলো আল্লাহ সম্পর্কে সংবাদ দেওয়ার অধ্যায়ে এসেছে তার মাঝে তারা পার্থক্য করেনি। কাজেই তাদের নিকট নামের অর্থ হলো সত্তা। আর এটি শুধু “আল্লাহ” নামের সঙ্গে খাস। আর ‘আল্লাহ’ ছাড়া যা রয়েছে তার অর্থ তাদের নিকট ঐসব সিফাত থেকে গ্রহণ করা হবে যা তারা সাব্যস্ত করেছেন। এখানে তারা নস (বর্ণিত ইলম) দ্বারা যা সাব্যস্ত হয় তার ওপর ক্ষান্ত করেনি।

৫- মাতুরীদিয়্যাগণ সিফাতের অধ্যায়ে কতক সিফাত সাব্যস্ত করা ও কতক সিফাত সাব্যস্ত না করার ওপর স্থির হয়েছেন। ফলে তারা কুদরত (ক্ষমতা), ইলম (জ্ঞান), হায়াত (জীবন), ইরাদাহ (ইচ্ছা), আস-সাম (শোনা), আল-বাসার (দেখা), আল-কালাম (কথা বলা), আত-তাকওয়ীন (সৃষ্টি করা) সিফাতগুলো সাব্যস্ত করেছেন। এর করণ হলো, তাদের নিকট বিবেক এসব সিফাতকে প্রমাণ করে।

৬- মাতুরীদিয়্যাগণ কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত সকল খাবরী সিফাতকে নাকচ করেছেন। কেননা তাদের ধারনায় সেগুলো সাব্যস্ত করার ভেতর বিবেকের বিরোধিতা রয়েছে, যেই বিবেক মনে করে যে, এগুলো সাব্যস্ত করলে আল্লাহ তা‘আলাকে সাদৃশ্যশীল ও শরীরী বলা আবশ্যক হয়।

৭- মাতুরীদিয়্যারা আল্লাহ তা‘আলার ইখতিয়ারী সিফাতকে নাকচ করেছেন। যেটি কর্মগত সিফাত এবং যা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে আবশ্যক। কেননা, তাদের নিকট তাও সাদৃশ্য ও শরীরকে আবশ্যক করে।

৮- মাতুরীদিয়্যারা গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহ তা‘আলার কালাম এক অর্থধারক কাদীম (চিরন্তন) আদি (স্থায়ী)। তার সঙ্গে আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছা ও কুদরতের সম্পর্ক নেই এবং তা হরফ ও শব্দ নয়, বরং তা হলো নাফসী কালাম যা শোনা যায় না, বরং কেবল তার প্রতিনিধিত্বকারী বাক্য শোনা যায়।

৯- মাতুরীদিয়্যারা নবীদের হাতে মুজিযা প্রকাশ পাওয়ার ওপর তাদের সততার দলিলকে সীমাবদ্ধ করেছেন, কেননা—তাদের ধারনায়—কেবল তাই ইয়াকিনী ইলমের ফায়দা প্রদান করে।

১০- মাতুরীদিয়্যারা মনে করেন যে,পরকাল দিবসের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল মাসআলা শ্রবণ করা ছাড়া শেখা যায় না। এ বিষয়ে সালাফগণ তাদের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, ওই সব মাসআলা শ্রবণ (বর্ণিত ইলম) দ্বারা জানা গেছে ঠিক, কিন্তু বিবেকও তার ওপর প্রমাণ বহন করে।

১১- মাতুরীদিয়্যাগণ আল্লাহর দিদারকে সাব্যস্ত করেন, তবে তার দিক ও মুখোমুখী হওয়াকে তারা অস্বীকার করেন। বস্তুত তাদের কথায় রয়েছে বৈপরীত্ব এবং তারা দিদারের যে অর্থ বুঝেছে তাতে রয়েছে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। যা এমন বস্তু সাব্যস্ত করতে বাধ্য করে যা দেখা কখনো সম্ভব নয়। তারা আরো অস্বীকার করে আল্লাহর জন্যে প্রমাণিত একেবারে উপরে হওয়ার সিফাতকে।

১২- মাতুরীদিয়্যারা বান্দার কর্মসমূহের ব্যাপারে যা গ্রহণ করেছেন সালাফগণ তাকে ভুল বিশ্বাস (আকিদা) গণ্য করেছেন। কেননা তাতে আল্লাহর ইচ্ছা থেকে স্বতন্ত্র বান্দার ইচ্ছাকে সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং আল্লাহ যে বান্দাদের কর্মসমূহ সৃষ্টি করেন সেটি তাদের ইচ্ছার পশ্চাৎগামী, যা মাখলুক নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে সালাফগণ বিশ্বাস করেন যে, একলা আল্লাহর জন্যে ইচ্ছা রয়েছে যেমন বান্দার জন্যে ইচ্ছা রয়েছে, তবে বান্দার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে নয়।

১৩- মাতুরীদিয়্যাগণ গ্রহণ করেছেন যে, ঈমান হলো কেবল অন্তরে তাসদীক (বিশ্বাস) করা। আর তাদের কেউ কেউ বলেছেন, ঈমান হলো অন্তরে বিশ্বাস করা ও জবানে স্বীকার করা। তারা ঈমানের হ্রাস ও বৃদ্ধিকে অস্বীকার করেন। এবং তাতে ইস্তিসনা করাকে হারাম বলেছেন। আর ঈমান ও ইসলামের অর্থের মাঝে পার্থক্যকে অস্বীকার করেছেন।

১৪- মাতুরীদিয়্যারা মনে করেন যে, ফাসিক পরিপূর্ণ ঈমানওয়ালা মুমিন।

আল্লাহু আযযা ও জাল্লার নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি আমাদেরকে হককে হক হিসেবে দেখা ও তার আনুগত্য করার তাওফিক দিন আর বাতিলকে বাতিল হিসেবে দেখা ও তার থেকে বাচার তাওফিক দিন। আল্লাহই ভালো জানেন। ওয়াসাল্লাল্লাহু ‘আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়ালা ‘আলিহি ওয়াসাহবিহী ওয়া সাল্লামা।

সামগ্রী

ভূমিকা... 4

ভূমিকাঃ 8

প্রথম অনুচ্ছেদঃমাতুরিদী ফেরকার পরিচয়ঃ 8

১- বংশ ও জীবনঃ 8

২- মাতুরিদীর রচনাবলীঃ 9

৩- মাতুরিদীর উস্তাদ ও ছাত্রগণ: 10

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ মাতুরিদী ফেরকার উত্থান। 12

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ মাতুরীদিয়্যাহ মতবাদ বিস্তার লাভ করার কারণসমূহ। 14

১- মূল কারণ, ... 14

২-মাতুরিদী ফেরকার মাদরাসাসমূহ এবং তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ও পাঠদান কার্যক্রম: 16

৩- লিখনীর ময়দানে মাতুরিদীদের তৎপরতা: 16

৪- আরো বিষয় রয়েছে যার সমষ্টি তাদের বিস্তার লাভ করা ও তাদের দ্বারা মানুষের প্রভাবিত হওয়ার ক্ষেত্রে শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছে, যা নিম্নরূপঃ 16

প্রথম অধ্যায়ঃমাতুরিদী ফেরকার নিকট শরীয়তের ইলম অর্জন করার উৎস এবং দলিল গ্রহণ করার নীতিমালা। 18

প্রথম পরিচ্ছেদঃ বিবেকের ওপর নির্ভর করা। 18

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ খবরে ওয়াহেদসমূহ দ্বারা আকিদার ক্ষেত্রে দলিল গ্রহণ না করা। 23

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : রূপক অর্থ সাব্যস্ত করা। 26
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : কুরআন ও হাদীসের(নসকে) দলীলকে ব্যাখ্যা করা অথবা (তার অর্থ আল্লাহতে) সোপর্দ করা প্রসঙ্গঃ 28
পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ ভালো ও মন্দ উভয়কে বিবেক নির্ণয় করে এমন বলা। 36
দ্বিতীয় অধ্যায়: আল্লাহর প্রতি ঈমান। 40
প্রথম পরিচ্ছেদঃ তাদের নিকট দলিলের পূর্বে আকল-বিবেক দ্বারা আল্লাহর পরিচয় হাসিল করা ওয়াজিব। 40
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ মুকাল্লিদের(অন্ধঅনুসারীদের) ঈমানের হুকুম। 43
তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ-আল্লাহর কর্মসমূহের তাওহীদ। 46
চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ। 54
তৃতীয় প্রকার : আল্লাহ তা'আলার নাম ও সিফাতসমূহে তাঁর তাওহীদ।" [৮৯] 58
তৃতীয় অধ্যায়ঃ ঈমানের অন্যান্য রোকন। 86
প্রথম পরিচ্ছেদ: রাসূলদের প্রতি ঈমান 86
প্রথম অনুচ্ছেদ : নবুওয়ত কীসের দ্বারা প্রমাণিত হয়। 86
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ মু'জিযাহ ও কারামাহ। 90
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শেষ দিবসের প্রতি ঈমান। 93
তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ফয়সালা ও তাকদীরের প্রতি ঈমান। 96
প্রথম অনুচ্ছেদঃ মাতুরীদিয়্যাদের নিকট ফায়সালা ও তাকদীরের স্তরসমূহ: 99
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ বান্দাদের কর্মসমূহ। 101

প্রথম দিকঃ বান্দাদের কর্মসমূহের সৃষ্টি। 101
দ্বিতীয় দিকঃ বান্দাদের তাদের কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক। 102
তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ কুদরত (শক্তি) ও ইস্তেতাআত (সামর্থ): 106
চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ সামর্থ নেই এমন জিনিসের দায়িত্ব প্রদান করা। 111
চতুর্থ অধ্যায়: ঈমানের মাসআলাসমূহ: 114
প্রথম পরিচ্ছেদঃ ঈমানের অর্থ ও তার হাকিকত। 114
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ঈমানের বৃদ্ধি ও হ্রাস। 121
তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ঈমানের ক্ষেত্রে ইস্তেসনা করা। 124
চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ ঈমান ও ইসলামের মাঝে সম্পর্ক। 127
পঞ্চম পরিচ্ছেঃ কবিরাহ গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির হুকুম। 131
পঞ্চম অধ্যায়ঃ মাতুরীদিয়্যাহ ও আশায়েরাদের মাঝে তুলনা 135
প্রথম পরিচ্ছেদঃ তাদের মাঝে হাকিকিভাবে বিতর্কীত মাসআলাসমূহ[২৫২]। 137
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ তাদের মাঝে শব্দগত ইখতিলাফি মাসআলাসমূহ[২৫৫]। 142
উপসংহারঃ 146
সামগ্রী 150

موسوعة المصطلحات الإسلامية
TerminologyEnc.com
موسوعة تضم ترجمات المصطلحات
الإسلامية وشروحها بعدة لغات

موسوعة الأحاديث النبوية
HadeethEnc.com
موسوعة تضم ترجمات للأحاديث
النبوية وشروحها بعدة لغات

موسوعة القرآن الكريم
QuranEnc.com
موسوعة تضم تفاسير وتراجم
موثوقة لمعاني القرآن الكريم

IslamHouse.com
مرجعية مجانية إلكترونية
موثوقة للتعريف بالإسلام

منتقى
المحتوى الإسلامي
موسوعة تضم المنتقى من
المحتوى الإسلامي باللغات

ننشر الإسلام بأكثر من 100 لغة

جمعية خدمة المحتوى
الإسلامي باللغات

جمعية الدعوة
وتوعية الجاليات بالربوة